EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

BA [Education]

Second Semester

[Bengali Edition]

Directorate of Distance Education

TRIPURA UNIVERSITY

Reviewer

Dr. Dilip Kr. Bose

Retired Professor, Burdwan Unversity

Author

Dr. Pratip Kumar Chatterjee, Retired Principal, Burdwan Raj College

Copyright © Reserved, 2016

Books are developed, printed and published on behalf of **Directorate of Distance Education, Tripura University** by Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

All rights reserved. No part of this publication which is material, protected by this copyright notice may not be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form of by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the DDE, Tripura University & Publisher.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: 7361, Ravindra Mansion, Ram Nagar, New Delhi – 110 055
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

সিলেবাস বই-ম্যাপিং টেবিল

সিলেবাস	বই ম্যাপিং
একক – ১ শিক্ষা মনোবিদ্যার ভূমিকা ধারণা প্রয়োজন এবং পরিধী, উপক্রমনিকা অংশ – চন্দ্রশেখর উপন্যাস, শিক্ষামনোবিদ্যার পদ্ধতি, শিক্ষণ এবং শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষা মনোবিদ্যার প্রয়োগ, শিক্ষণ এবং শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষামনোবিদ্যার প্রয়োগ, মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষার স্বরূপ, বিকাশের স্তর পরম্পরা, বয়ঃসন্ধিক্ষণ, যৌবনাগম।	একক – ১ (পৃষ্ঠা ১–২৩)
একক – ২ বুদ্ধি (Intelligence) বুদ্ধির সংজ্ঞা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য ও শিল্পীমানস, Spearman-এর দ্বি-উপাদান তত্ত, Thorndike-এর বহু উপাদান তত্ত্ব Thompson-এর বাছাই তত্ত্ব, স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান-তত্ত্ব, থার্স্টোনের প্রাথমিক শক্তি তত্ত্ব।	একক – ২ (পৃষ্ঠা ২৫–৪৮)
একক – ৩ ব্যক্তিত্ব (Personality) ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা, ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, ব্যক্তিগত বৈষম্য এর শিক্ষা মূলক তাৎপর্য,Thorndike প্রবর্তিত সংযোগবাদ থর্নডাইকের সংযোজনবাদ, থর্নডাইকের শিখনের সূত্রাবলী, অর্থপূর্ণ শিখন Gestalt মতবাদের তাৎপর্য, শিক্ষায় গেস্টাল্টতত্ত্বের প্রয়োগ।	একক – ৩ (পৃষ্ঠা ৪৯–৭৭)
একক – ৪ শিখন (Learning) শিখনের সঞ্চালন, শিখনের সঙ্গে জড়িত উপাদান সমূহ, শিক্ষায় প্রেষণার ত্রিবিধ কাজ সৃজনশীলতার তত্ত্ব ও সংজ্ঞা, সৃজনশীলতার চিহ্নিতকরণ	একক – ৪ (পৃষ্ঠা ৭৯–৯০)

সূচীপত্র

একক – ১ শিক্ষা মনোবিদ্যার ভূমিকা (পৃষ্ঠা ১–২৩)

- ভূমিকা
- এককের উদ্দেশ্য
- ধারণা প্রয়োজন এবং পরিধী
- উপক্রমনিকা অংশ – চন্দ্রশেখর উপন্যাস
- শিক্ষামনোবিদ্যার পদ্ধতি
- শিক্ষণ এবং শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষা মনোবিদ্যার প্রয়োগ
- শিক্ষণ এবং শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষামনোবিদ্যার প্রয়োগ
- মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষার স্বরূপ
- বিকাশের স্তর পরম্পরা
- বয়ঃসন্ধিক্ষণ
- যৌবনাগম
- গ্রন্থপঞ্জী

একক – ২ বুদ্ধি (Intelligence) (পৃষ্ঠা ২৫–৪৮)

- বুদ্ধির সংজ্ঞা
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য ও শিল্পীমানস
- Spearman-এর দ্বি-উপাদান তত্ত
- Thorndike-এর বহু উপাদান তত্ত্ব
- Thompson-এর বাছাই তত্ত্ব
- স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান-তত্ত্ব
- থার্স্টোনের প্রাথমিক শক্তি তত্ত্ব

একক – ৩ ব্যক্তিত্ব (Personality) (পৃষ্ঠা ৪৯–৭৭)

- ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা
- ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য
- ব্যক্তিত্বের বিকাশ

টিপ্পনী

টিপ্পনী

- ব্যক্তিগত বৈষম্য এর শিক্ষা মূলক তাৎপর্য
- Thorndike প্রবর্তিত সংযোগবাদ
- থর্নডাইকের সংযোজনবাদ
- থর্নডাইকের শিখনের সূত্রাবলী
- অর্থপূর্ণ শিখন
- Gestalt মতবাদের তাৎপর্য
- শিক্ষায় গেস্টাল্টতত্ত্বের প্রয়োগ

একক - ৪ শিখন (Learning) (পৃষ্ঠা ৭৯-৯০)

- শিখনের সঞ্চালন
- শিখনের সঙ্গে জড়িত উপাদান সমূহ
- শিক্ষায় প্রেষণার ত্রিবিধ কাজ
- সৃজনশীলতার তত্ত্ব ও সংজ্ঞা
- সৃজনশীলতার চিহ্নিতকরণ

ভূমিকা

পুরোভাষ

টিপ্পনী

আমার বইখানি লেখার পিছনে দুটি প্রধান কারণ আছে।

প্রথম, আমার নাতিদীর্ঘ অধ্যাপক জীবনে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের একটি সন্তোষজনক বাংলা সংস্করণের অভাব প্রতিপদে অতি তীব্রভাবে অনুভব করে এসেছি। কি শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগে, কি নব প্রবর্তিত বি. এ. ক্লাসে সর্বত্রই শিক্ষাবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীগণ নির্ভরযোগ্য একটি শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের বাংলা বইয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাকে বারবার অবহিত করে এসেছে। তাঁদের প্রেরণায় ও তাড়নায় এবং তাদের অভাব মেটানোর জন্যই এই বইটি লেখা।

দ্বিতীয় কারণটি আরও ব্যাপক এবং আমার একান্ত নিজস্বভাবে অনুভব করা। যেদিন ছাত্ররূপে মনোবিজ্ঞানের রহস্যময় রাজ্যে প্রবেশ করি সেদিন থেকেই মানব-আচরণের অনাবিষ্কৃত প্রদেশগুলির বৈচিত্র্য ও বিবিধতা আমাকে চমৎকৃত করে এসেছে। আরও বেশী চমৎকৃত ও মুগ্ধ করে এসেছে সেই রহস্য ভেদ করার জন্য বিদেশী গবেষক ও শিক্ষাব্রতীগণের অনলস বিরামহীন প্রচেষ্টা। তাঁদেরই গবেষণালব্ধ তথ্যে আজ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কলেবর সমৃদ্ধ এবং সেই মূল্যবান তথ্যগুলির বাস্তব প্রয়োগেই শিক্ষার বহু সমস্যা সমাধানের পথে।

ভারতের শিক্ষা সমস্যারূপ সহস্র রাহুল কবলস্থ হলেও তাকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা অত্যন্ত উদাসীন। বাঁধ, স্টিলপ্ল্যান্ট, নভস্পর্শী প্রাসাদ প্রভৃতি নির্মাণের ফাঁকে ফাঁকে স্বাধীন ভারতের সরকার ইতস্তত দু'একটি শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের গবেষণাগার স্থাপন করলেও এক্ষেত্রে সত্যকারের অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে তা শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। উদাহরণস্বরূপ, বাংলা ভাষায় ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি পরিমাপের একটি নির্ভরযোগ্য অভীক্ষা আজও পর্যন্ত তৈরী হয়নি, অথচ ইংল্যান্ড, আমেরিকা যার সংখ্যা গুণে শেষ করা যায় না।

এই দৈন্যের একটি বড় কারণ হল শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে পিতামাতা শিক্ষক ও সাধারণ শিক্ষাব্রতীগণের মধ্যে সচেতনতার অভাব। তাঁদের সকলের মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ভিন্ন সত্যকারের শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান কখনই গড়ে উঠতে পারে না। মনে রাখতে হবে যে ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা অশিক্ষার চেয়ে কোন অংশে ক্ষতিকর নয়। অথচ আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি এমন কতকগুলি প্রাচীন মনোবিজ্ঞান-বিরোধী নীতির উপর প্রতিষ্ঠিতস যেগুলির প্রভাবে সমগ্র শিক্ষাপ্রচেষ্ঠাই বিরাট একটি অপচয়ে পর্যবসিত

হয়ে পড়েছে। ভারতের শিক্ষাকে এই কলঙ্ক থেকে মুক্ত করতে হলে পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাব্রতী সকলকেই সম্মিলিত ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। সেই আগামী শুভদিনটির অগ্রদূত রূপে আমার এই বইখানি অর্পণ করলাম। এই বইটি শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে তাঁদের পরিচিত করে দেবে এবং শিক্ষার সমস্যাগুলির স্বরূপ ও গুরুত্ব সম্বন্ধে একটি বাস্তব ছবি তাঁদের সামনে তুলে ধরবে।

একক - ১ শিক্ষা মনোবিদ্যার ভূমিকা (Introduction to Educational Psychlogy)

১.০ ভূমিকা (Introduction)

মনোবিদ্যার প্রায়োজিক (applied) দিকের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল শিক্ষা-মনোবিদ্যা (Educational Psychology)। জোর করে কাউকে শেখানো যায় না; শিক্ষার্থী অথবা শিক্ষার্থনীর অবশ্যই স্বতঃস্ফূর্ত্ততা থাকা দরকার।আগেকার দিনে মনোবৈজ্ঞানিক কোনো পদ্ধতিই গ্রহণ করা হত না - প্রচলিত ছিল কতকগুলো বিশ্বাস ও কল্পিত ধারণা। কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখি শিক্ষণ পদ্ধতি মনোবৈজ্ঞানিক ও সুপ্রমাণিত তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

টিপ্পনী

প্রজ্ঞামূলক (Cognitive) এবং আচরণমূলক (Behavioral) প্রেক্ষিত শিখন (Learning) প্রক্রিয়ার অধ্যায়ন শেষ পর্যন্ত গবেষকদের বুদ্ধি, প্রজ্ঞামূলক বিকাশ, প্রেরণা (Motivation) ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের ব্যবস্থা সীমার বোঝাবার জন্য অনুপ্রাণিত করে থাকে। এই ভাবে দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ক্ষেত্র পরিমাণগত পদ্ধতি (Quanfitative Method)-র উপর নির্ভর করে, এর মধ্যে আছে অভীক্ষা (Testing), পরিমাণ (Measurenment), শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থাপনা (Classroom Management) এবং মূল্যায়ণ। এ সব কিছুই শিখন প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে থাকে।

এই একক পাঠ করার পর তুমি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারবে

১.১ এককের উদ্দেশ্য (Unit Objectives)

- শিক্ষা মনোবিদ্যার ধারণা (Concept), প্রয়োজন এবং পরিধী সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারবে।
- শিক্ষা মনোবিদ্যার পদ্ধতি নিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- শিক্ষণ (Teaching) এবং শিখন উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষা মনোবিদ্যার প্রয়োগ আলোচনা করতে পারবে।
- বৃদ্ধি (Growth) এবং বিকাশ (Development)-এর বিভিন্ন স্তর নিয়ে আলোচনা করতে পারবে।
- বয়ঃসন্ধিক্ষণ (Adolescence) এবং তার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবে।

১.২ ধারণা প্রয়োজন এবং পরিধী (Concept, Need and Scope)

শব্দ মাত্র দুটি - মনোবিদ্যা এবং শিক্ষা এই নিয়ে শিক্ষা মনোবিদ্যার গঠন। এবার আমরা কিছু সুবিদিত মনোবিজ্ঞানীর দেওয়া সংজ্ঞা আলোচনা করব। সাধারণ ভাবে মনোবিজ্ঞানে মানুষ

সহ সমস্ত প্রাণীর আচরণকে চর্চার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে থাকে; সেহেতু মনোবিজ্ঞানের একটা শাখা হিসেবে শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত আচরণকেই শিক্ষা মনোবিদ্যার অধীতব্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা দরকার। এখানে মনে রাখতে হবে যে মানুষের আচরণই শিক্ষা মনোবিদ্যার ভিত্তি। আমরা এবার দেখি এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শিক্ষা মনোবিদ্যার সংজ্ঞাগুলি কিভাবে আমাদের সামনে ধরা দিচ্ছে। L.D. Crow এবং A. Crow নিম্নলিখিত ভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন ঃ "শিক্ষা মনোবিদ্যা মানুষের জন্ম থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত সমস্ত শিখন সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেয়।" ("Educational Psychology describes and explains the learning experiences of an individual from birth to the learning experiences of an individual from birth to old age.") এখানে লক্ষ্য করতে হবে 'শিখন সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা' এই শব্দ বন্ধটির তাৎপর্য কী? শিক্ষার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য সহায়ক বিষয়গুলি এখানে স্থান পায়নি। সংজ্ঞাটি কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর দিকেই ধাবিত। Bernard বলেছেন ঃ "শিক্ষা মনোবিদ্যা শিখন ও শিক্ষণ বিশেষত বিদ্যালয়ে শিক্ষা নিয়ে চর্চা করে যা সমাজের শিখন সহায়ক প্রথাগত প্রতিষ্ঠান" ("Educational Psychology deals with learning and teaching especially in schools, which is society's formal institution for facilitating learning.")

C.E. Skinner মনে করেন ঃ "শিক্ষা মনোবিদ্যা মনোবিদ্যার সেই শাখা যা শিক্ষণ ও শিখন বিষয়ে চর্চা করে" ("Educational Psychology is that branch of psychology that deals with teaching and learning.")

Kolensik বলেছেন ঃ "মনোবিজ্ঞানের যে সব তথ্য ও নীতির সাহায্যে শিক্ষার উন্নয়ন ও ব্যাখ্যা করা যায় তার চর্চাই হল শিক্ষা মনোবিদ্যা" ("Educational Psychology is the study of those facts and principles which help to explain and improve the process of education.")

ওপরের সংজ্ঞাগুলোকে বিশ্লেষণ করে আমরা দেখলাম যে তাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য খুবই সামান্য। কিন্তু এটা ঠিক যে সব সংজ্ঞাতেই মনোবিদ্যা ও শিক্ষার যোগসূত্রটি প্রাধান্য পেয়েছে। কিছু মনোবিজ্ঞানী যেমন, S.N. Eliot এবং তাঁর সহযোগীরা মনে করেন যে শিক্ষা মনোবিদ্যা এমন একটি বিদ্যা যা শিক্ষা ও মনোবিদ্যার মধ্যে সেতু স্বরূপ। এবং যার প্রধান আগ্রহের বিষয় শিক্ষণ ও শিখনের চর্চায় এবং প্রয়োগে মনোবিদ্যা সম্মত পদ্ধতির ব্যবহার করা।

শিক্ষা মনোবিদ্যার কি কোনো প্রয়োজনীয়তা রয়েছে? নিশ্চয়ই আছে। উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি স্থির করা সহজ কাজ নয়। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীরা দীর্ঘকাল যাবৎ গবেষণা করে প্রচলিত শিক্ষণ এবং তাঁর আরও উদ্দেশ্যমুখী সংগঠিত রূপ নির্দেশনা (Instruction) সম্বন্ধে যে সব তথ্য জানতে পেরেছেন সে সম্বন্ধে ধারণা না থাকলে শিক্ষকের পক্ষে সফল হওয়া অসম্ভব।

শিক্ষার গতি সঠিক পথে চালনা করার প্রধান হাতিয়ার মূল্যায়ন (Evaluation)। যে কোনো আধুনিক শিক্ষক বা শিক্ষিকা এমন জানেন তিনি কিসের ভিত্তিতে পাঠ পরিকল্পনা করবেন। সাম্প্রতিক কালে শ্রেণীকক্ষের পরিচালনার বিষয়টি শিক্ষা মনোবিদ্যার একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

আমরা ভাবি এমন একটা রূপকল্প (Imagery)-র কথা - যেখানে শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন ধরনের ছাত্রদের সামনে বসে রয়েছেন শিক্ষক। ছাত্রদের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন প্রলক্ষণ (frait) অথবা বৈশিষ্ট্য, শক্তি অথবা সামর্থ্য। একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল ভিত্তিভূমি হল বৈশিষ্ট্য-সময়িত ভিন্ন ভিন্ন ছাত্র। এই বৈশিষ্ট্যগুলো কীভাবে তাঁরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকে? একটা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আর একটা বৈশিষ্ট্যের বা কী পার্থক্য রয়েছে? শিক্ষকের এসবগুলোই জানা প্রয়োজন। এখানেই নিহিত রয়েছে শিক্ষা মনোবিদ্যার গুরুত্ব। এগুলোর কোনো কিছু না জেনে অর্থাৎ ছাত্রদের পটভূমি না বুঝে শিক্ষক এক পাও এগোতে পারেন না।

টিপ্পনী

শ্রেণীকক্ষে যে সমস্ত ছাত্র উপস্থিত থাকে তাদের মধ্যে ব্যাপক তফাৎ লক্ষ্য করতে পারা যায় এবং সেই সমস্ত ছাত্রদের নিয়েই শিক্ষকদের চলতে হয়। ছাত্রদের সামর্থ্য, অনুরাগ, প্রতিন্যাস (Atitude), চাহিদা, পরিবর্ধনের ক্রমিক ধারা এবং শিখনের পূর্ববর্ত্তী স্তর সম্বন্ধীয় যে ব্যক্তিগত পার্থক্য রয়েছে সেগুলো শিক্ষকের জানা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং সে ব্যাপারে শিক্ষা মনোবিদ্যা শিক্ষকদের যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে। সে মূহূর্ত্তে তিনি এ সম্বন্ধে অবহিত হন সেই মূহূর্ত্তে শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিবর্তন করে থাকেন। এই ভাবে শিক্ষক এক সুন্দর শিক্ষাদান পরিস্থিতির সৃষ্টি করে থাকেন। এর ফলে তিনি শ্রেণীকক্ষে সমান তালে চলতে পারেন। শিশু সম্বন্ধীয় সব কিছুই জানতে পারা যাবে শিশুদের অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে; এটাই শিক্ষা মনোবিদ্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

তোমার প্রগতি ঠিক কর (Check your progress) ঃ

১. শিক্ষা মনোবিদ্যার বিচার্য্য বিষয় কী?

২. পরিতব্য বিষয়ের জ্ঞান যে রকম অপরিহার্য্য, শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধেও জ্ঞান সেই রকম ভাবে প্রয়োজনীয় কেন?

১.৩ শিক্ষামনোবিদ্যার পদ্ধতি (Methods of Educational Psychology) ঃ

শিক্ষা মনোবিদ্যা শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার উন্নতিকল্পে বিবিধ পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকে। শিশুদের স্বভাব সম্বন্ধে এই পদ্ধতির প্রয়োগ কীভাবে তারা শিক্ষা লাভ করে এবং কীভাবেই বা তাদের পরিবর্ধন হয় এ সম্বন্ধে জানার জন্য পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। আমরা আগেই দেখেছি শিক্ষা মনোবিদ্যা সাধারণ মনোবিদ্যা (General Psychology)-র প্রায়োগিক শাখা সেই হেতু ঐ মনোবিদ্যায় যে সমস্ত পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটানো হয় এখানে সেই সব পদ্ধতির প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই।

পর্যবেক্ষণ (Observation) শিক্ষা মনোবিদ্যার প্রাথমিক পদ্ধতি। শিক্ষামনোবিদ্যার ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ আচরণ করার সময় কী ধরনের মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তা বাইরে থেকে সঠিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় না। এই জন্য শিক্ষা মনোবিদ্যায় দুরকমের পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি আছে -

ক) ব্যক্তি নির্ভর পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি বা অন্তঃর্দর্শন (Subjective Method of Obser-

vation or Introspection)।

খ) নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Objective Method of Observation)।

ক) ব্যক্তি স্বয়ং যখন নিজের ক্রিয়া প্রক্রিয়ার প্রতি মনোযোগী হয় তখন সেই পদ্ধতিকে বলা হয় অন্তঃর্দর্শন। এই কথাই মনোবিজ্ঞানী Stout সুন্দর ভাবে বলে গেছেন। এই পদ্ধতিতে মন কে নিজের মধ্যে অভিক্ষেপ এবং তার দ্বারা সেখানে কী ঘটছে তা জানবার চেষ্টা করা হয়। সত্য সত্যই কী এই প্রক্রিয়ার দ্বারা মানস ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণ করা যায়? পর্যবেক্ষণ করতে হলে কম পক্ষে দু-সেকেন্ডের প্রয়োজন - এক সেকেন্ড তার সৃষ্টি এবং আর এক সেকেন্ড তার অবস্থিতি কিন্তু কোনো মানস প্রক্রিয়াই এক সেকেন্ডের বেশী স্থায়ী হয় না। এই সব কারনে অন্তঃর্দর্শনকে অনেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করেন না।

টিপ্পনী

খ) - নৈঃর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণ হল অন্যের পরিবর্তন বাইরে থেকে লক্ষ্য করা। এই পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির দ্বারা আচরণের অনুশীলন করা যায়। সাধারণভাবে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করতে গিয়ে শিক্ষকগণ ছাত্রদের নানারকম আচরণ পর্যবেক্ষণ করেন। যে ব্যক্তি পর্যবেক্ষণ করছে তার ব্যক্তিগত প্রভাব থেকে অপরকে মুক্ত করা যায় না। এই কারনে নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণেও নানা রকমের ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা যায়। এর ত্রুটি থাকলেও একে বাদ দিয়ে শিক্ষা মনোবিদ্যা চলতে পারে না। এই পদ্ধতির উন্নতিকল্পে নানারকম কৌশল অবলম্বন করা হয় Rating Scale, Time samples, Anecdotal record, Interview, Questionaire, Test ইত্যাদি।

পরীক্ষণ (Experimentation) - শিক্ষা মনোবিদ্যার অন্য পদ্ধতি হল পরীক্ষণ। পরীক্ষণ বলতে আমরা বুঝি নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ। প্রয়োজন মত কতকগুলো অবস্থা বা চল (Variable) নিয়ন্ত্রণ করে যে কোনো একটিকে বিশেষ ভাবে পর্যবেক্ষণ করার নাম পরীক্ষণ। পরীক্ষণের জন্য শিক্ষা মনোবিদ্যার দুজন ব্যক্তির প্রয়োজন। একজন পরীক্ষক আর একজন পরীক্ষার্থী (Subject) অর্থাৎ যার অভিজ্ঞতা বা আচরণ নিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। শিক্ষামনোবিদ্যার ক্ষেত্রে অনেক সময় পরীক্ষার্থীর প্রকৃতির পরিবর্তন করা হয়। ধরা যাক, আমরা দেখতে চাই শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করলে তাদের শিখনের উন্নতি হয় কিনা। কিছু দিন ধরে তাদের প্রশংসা করে আমরা দেখতে পারি তাদের শিখনের উন্নতি হচ্ছে কিনা। আবার কিছুদিন পরে তাদের প্রশংসা না করে দেখা হবে। পরে তুলনামূলক আলোচনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারা যাবে, যে দলের উপর কোনো বিশেষ অবস্থার প্রভাব আমরা দেখতে চাইছি তাকে বলা হয় পরীক্ষামূলক দল (experimental group)। আর অন্য দলটিকে বলা হয় নিয়ন্ত্রিত দল (controlled group)।

মানসিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি (clinical method) ব্যবহার করা হয়, অনেক সময় সে সব পদ্ধতিও শিক্ষা-মনোবিদ্যায় ব্যবহার করা হয়। Freud প্রবর্তিত মুক্ত অনুষঙ্গ (free ansoriafion) দ্যুতি বিশেষভাবে শিক্ষা-মনোবিদ্যায় প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীদের কোনো আচরণমূলক অপসঙ্গতিকে বিশ্লেষণ করার জন্য। এ ছাড়া তাদের ব্যক্তি সভার সামগ্রিক স্বরূপ নির্ধারণ করার জন্য বিভিন্ন ধরণের অভীক্ষা (test) ও প্রশ্নাবলী (questionanasive) ব্যবহার করা হয়। এই সব অভীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে ব্যক্তির আচরণ ও ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
4

সমস্যামুক্ত ব্যক্তির অনুশীলন (Case Study) ঃ শিক্ষা মনোবিদ্যায় এই পদ্ধতিও ব্যবহার করা হয়ে থাকে এই পদ্ধতি অনুযায়ী কোনো বিশেষ সমস্যা যুক্ত শিক্ষার্থী সামগ্রিক পরিবেশ

অধ্যয়ন করে তার সমস্যার কারন খুঁজে বার করার চেষ্টা করা হয়। যদি কোনো শিক্ষার্থী বারবার কোনো অসামাজিক আচরণ করতে থাকে তবে তা দুর করার জন্য তার প্রকৃত কারন খুঁজে বের করতে হবে। এই কারন খুঁজে বের করার জন্য শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ জীবন-পরিবেশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তার সামগ্রিক জীবন, পারিবারিক জীবন ইত্যাদি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে হবে। তার পরে এই তথ্য বিশ্লেষণ করে তবেই অসামাজিক আচরণের কারণ নির্ধারণ করতে হবে। বিশেষ বিশেষ সমস্যা যুক্ত শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানের জন্য সাধারণতঃ শিক্ষা মনোবিদ্যায় এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

চিকিৎসামূলক পদ্ধতি (Clinical Method)-র সহকারী পদ্ধতিরূপে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে কোনো একটি বিশেষ অবস্থাকে জানতে হলে তার পূর্ববর্ত্তী।

টিপ্পনী

১.৪ শিক্ষণ এবং শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষা মনোবিদ্যার প্রয়োগ ঃ

শিক্ষামনোবিদ্যা (Educational Psychology) ঃ

শিক্ষা সম্বন্ধে যে মতবাদ রয়েছে তা শিক্ষা অনুশীলনের চেয়ে অনেক এগিয়ে। উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ করেন যাঁরা তাত্ত্বিক, অর্থাৎ যাঁরা শিক্ষা সম্বন্ধে কচ্‌কচানি করেন তাঁরা বাস্তব জীবনে এবং বিদ্যালয়ের জীবনে তাঁদের তাত্ত্বিক নীতিগুলোকে প্রয়োগ করেননি। তত্ত্ব এবং প্রয়োগের মধ্যে বিরাট ফারাক। তবু আমরা বলতে পারি যে যাঁরা বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক (Pure Theorist) তাঁরা অনেক সময় বাস্তবে তত্ত্ব অনুশীলনকারীদের প্রতি একটা বার্তা রেখে যান। এই অনুশীলনকারীর দল প্রত্যহ শিক্ষাদানে ব্যস্ত থাকেন। এই তাত্ত্বিকরা তাঁদের অবদান রেখে গেছেন বলেই শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি আমরা লক্ষ করতে পারি। বর্তমানের চেয়ে অতীতের ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য ছিল। সব ধরনের শিক্ষক ঐতিহ্য এবং প্রচলিত প্রথার মাধ্যমে পরিচালিত হতেন; তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল খুব সংকীর্ণ। তবুও এদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা সাধারণ স্তরের উর্ধ্বে উঠে একটা উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারতেন।

বহুদিন ধরে শিশুকে স্বাধীন সত্তারূপে গ্রহণ করা হত না; তার যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা তার পরিবর্ধনকে নিয়ন্ত্রণ করে থকে, তা উপেক্ষা করা হত। শিশুকে একটা ক্ষুদ্র প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি (Miniature adult) রূপে গণ্য করা হত। এই সব ধ্যান-ধারণা প্রচলিত ছিল সপ্তাদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে। ধীরে ধীরে শিশুর উপযুক্ত পাঠ্যসূচি তৈরী করা হল; শিশুকে পাঠ্যসূচির উপযুক্ত করার কোনো প্রয়াস ছিল না।

Rousseau তাঁর গ্রন্থ বিখ্যাত গ্রন্থ 'Emile'-এ পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করলেন যে শিক্ষাকে এমন হতে হবে যা শিশু অনায়াসে গ্রহণ করে নিতে পারে। পূর্বনির্ধারিত ও বয়স্ক ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে শিশুকে নিয়ে গেলে চলবে না। এবার শিক্ষামনোবিদ্যা সম্বন্ধে আমরা কতকগুলো সংজ্ঞা দেখে নিতে পারি। যেমন, W. B. Kolesnik বলেছেন, "শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিদ্যা সম্বন্ধীয় তথ্য এবং মতবাদের প্রয়োগ হল শিক্ষামনোবিদ্যা।" C. E. Skinner বলেছেন, "শিক্ষা পরিস্থিতিতে মানুষের অভিজ্ঞতা এবং আচরণের সুষ্ঠু প্রয়োগ হল শিক্ষামনোবিদ্যা।"

টিপ্পনী

শিশু কোন্ শ্রেণিতে পড়বার উপযুক্ত অথবা সে কোন্ ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে তা জানা বিশেষভাবে প্রয়োজন। তার জন্য তার বুদ্ধির পরিমাপ করতে হবে। কাজেই 'বুদ্ধি' কী এবং কীভাবেই তার পরিমাপ সম্ভব তা শিক্ষামনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে অন্যতম। বুদ্ধির পরিমাপ করে সঠিক শ্রেণিতে শিশুকে ভরতি করলে শিক্ষকের পরবর্তীকালে সেই শিশুকে নিয়ে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না।

শিশু যখন শিক্ষা গ্রহণ করছে এবং শিক্ষক যখন শিক্ষাদান করছেন সেই সময় মনের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক কী, মনোযোগের কারণ কী কী, স্মৃতির উদ্রেক কীভাবে হয়, সহজাত বৃত্তি, আবেগ ইত্যাদির সম্বন্ধে যদি শিক্ষকের উপযুক্ত জ্ঞান না থাকে তাহলে তিনি তাঁর কাজ সার্থকভাবে করতে পারবেন না। এই সব আলোচনাই শিক্ষামনোবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষককে আরও লক্ষ রাখতে হবে যে শিক্ষাদানকালে শিশু প্রদত্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে কি না। শিক্ষাদান কার্যটি শিশুর কাছে যেন সুখদায়ক হয়; নয়তো শিক্ষাদান ব্যর্থ হয়ে যাবে। শিশুমনে অনুভূতি ও আবেগের স্থান কতটুকু তাও শিক্ষামনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। শিক্ষাদানের রীতি কী হবে, শিক্ষার অন্তরায় স্বরূপ যে ক্লান্তি বা অবসাদ তা কী করে দূর করতে পারা যাবে এবং শিশুর নিকট শিক্ষাকে কীভাবে আরও আকর্ষণীয় করতে পারা যায় তাও শিক্ষা-মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

যদিও শিক্ষা আবাল-বৃদ্ধি-বণিতা নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তবুও বলতে পারা যায় যে, পরিণত অপেক্ষা অপরিণত শিশু বা কিশোর মনই শিক্ষামনোবিদ্যার প্রধান লক্ষ্য। শিশুমন বা কিশোরমন অপেক্ষাকৃতভাবে নির্মল এবং বাইরের সবকিছু প্রভাব থেকে মুক্ত। এরূপ মনই শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে উপযুক্ত। অপরপক্ষে বয়স্ক এবং পরিণত মন সংস্কারে নিমজ্জিত। সহজে এই মন কিছু গ্রহণ করতে নারাজ।

শিশু খেলতে ভালোবাসে। বাইরে যখন বৃষ্টি হচ্ছে তখন ক্লাসঘরের মধ্যে বসে পড়াশোনা করতে শিশু চায় না। কাজেই খেলার মধ্যে দিয়ে শিশুকে কীভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় তাও শিক্ষামনোবিদ্যার পরিধিভুক্ত। শিক্ষকের মধ্যে কী কী গুণ থাকা দরকার, যা শিশু অনুকরণ করে অনুপ্রাণিত হবে তাও এই মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। ধরা যাক, কোনো একটা বিশেষ আবেগ শিশুর মনকে আন্দোলিত করছে অর্থাৎ বিশেষভাবে নাড়া দিচ্ছে; তার দরকার একটা বিশেষ পথে প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। আবেগের গতিপথ রুদ্ধ হল বটে; কিন্তু সাথে সাথে দেখতে হবে শিশু যেন অস্বভাবী (Abnormal) না হয়ে ওঠে। এটা শিক্ষা-মনোবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষামনোবিদ্যার ক্ষেত্রে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য Pestalozzi, Froebel, Rousseau, Herbert, Ebbinghaus, Galton, Binet ও Cyril Bart। এঁরা নানাজন নানাভাবে শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করে তোলার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হল তাঁদের উদ্ভাবিত পদ্ধতি ও চিন্তা-ভাবনা আধুনিক শিক্ষামনোবিদ্যায় আগেকার গৌরব হারিয়ে ফেলেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এগিয়ে এসেছেন আর এক দল শিক্ষাবিদ্ যাঁরা শিক্ষা-মনোবিদ্যাকে নতুন আলোকে দেখার চেষ্টা করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন John Dewey, Maria Montessori প্রভৃতি। অতীত অবস্থাগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে জানা সম্ভব নয়। এই পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে অতীত

অবস্থার ইতিহাস জানা যায়। গবেষণার বিষয় ব্যক্তি হতে পারে, পরিবার, বিদ্যালয়, একদল অপরাধী শিশু, বিদ্যালয় ছুট অথবা য়ে কোনো শিক্ষার্থীর দল হতে পারে। Freud-এর পদ্ধতি সমস্যাযুক্ত ব্যক্তির অনুশীলনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এর সুবিধা এবং অসুবিধা দুই আছে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখলাম যে শিক্ষামনোবিদ্যা নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষার্থীরা শিক্ষাকালীন যে সমস্ত বৈচিত্র্যময় আচরণ করে তার সবগুলিকে কখনওই নির্দিষ্ট কোনো একটি পদ্ধতির দ্বারা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। তাই কোনো একটি সমস্যা অনুযায়ী কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী কী ধরনের আচরণ করছে সেই অনুযায়ী পদ্ধতি নির্বাচনী করা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই একের বেশী পদ্ধতি একবারে প্রয়োগ করে সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করা হয়।

টিপ্পনী

১.৪ শিক্ষণ এবং শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষামনোবিদ্যার প্রয়োগ (Application of Educational Psychology) ঃ

শিক্ষার স্বরূপ

মনোবিজ্ঞান বলতে কি বুঝি এবং তর কাজই বা কি তা আমরা মোটামুটি জেনেছি। এখন শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক জানতে হলে শিক্ষার স্বরূপ জানা দরকার। সাধারণ মানুষ শিক্ষার যে অর্থের সঙ্গে পরিচিত সেটা হল শিক্ষার একটি অতি সঙ্কীর্ণ অর্থ। স্কুল, কলেজ প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থলব্ধ বিদ্যাকেই আমরা সাধারণত শিক্ষা বলে থাকি। শিক্ষিত-অশিক্ষিতের ভেদও আমরা করি গ্রন্থলব্ধ জ্ঞানের তারতম্যের উপর। যে লোক লিখতে-পড়তে জানে না তাকে আমরা অশিক্ষিত বলি। কিন্তু এইভাবে কেবলমাত্র বিশেষধর্মী কোন জ্ঞানের অর্জনকে শিক্ষা বলার অর্থই হল শিক্ষাকে একটি অতি সঙ্কীর্ণ গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলা।

এই সঙ্কীর্ণ অর্থে শিক্ষা হয়ে দাঁড়ায় বিশেষ কোন সামাজিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্যের জন্য ব্যক্তির প্রস্তুতীকরণ। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার পরিসীমা আরও অনেক বড়-সারা জীবনব্যাপী। এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি যে নতুন অভিজ্ঞতা বা প্রাণীর বর্তমান আচরণকে পরিবর্তিত করে নতুন আচরণের সৃষ্টি করা। কাঁটাচামচের সাহায্যে ভোজনে অনভ্যস্ত কোন ভদ্রলোকের বিসদৃশ আচরণ তাঁর এক বিলাতফেরৎ বন্ধুর ডিনার-টেবিলে প্রথম দিন সমবেত অতিথিগণের হাস্যকৌতুকের বস্তু হয়ে উঠল। কিন্তু দ্বিতীয় দিন দেখা গেল যে সেই ভদ্রলোকই নিপুণ হাতে কাঁটাচামচ চালাচ্ছেন এবং সেদিন তাঁর আচরণ আর কারও হাস্যোদ্রেক করল না। এই যে দ্বিতীয় দিনে ভদ্রলোকের আচরণের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিল এটা হল শিক্ষাপ্রসূত এবং পূর্ব দিনের ডিনার-টেবিলের অভিজ্ঞতাই হল ভদ্রলোকের ক্ষেত্রে শিক্ষা। এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষা কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা ঘটনাবিশেষে সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রতিটি প্রাণীর জীবনে এই শিক্ষা চলছে নিরন্তর ছেদহীন ধারায়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে প্রতিনিয়তই শিক্ষা গ্রহণ করে চলছে-প্রকৃতির সর্বজনীন পাঠশালায়। এক কথায় প্রাণীর জীবনবিকাশের সঙ্গে এ শিক্ষা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সমার্থক। এ অর্থে কেউ নিরক্ষর থাকতে পারে কিন্তু সত্যকারের শিক্ষাবর্জিত কেউই থাকতে পারে না।

টিপ্পনী

মানুষমাত্রেই কোন না কোন সমাজে বাস করে। তার প্রত্যেকটির আচরণ তার নিজের সমাজের সংগঠনের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। প্রত্যেক সমাজের সংরক্ষণের জন্য সেই সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিরই বিশেষ কতকগুলি আচরণ সম্পাদন করতে পারা অবশ্য প্রয়োজন। সেজন্য কোন সমাজের অস্তিত্ব বজায় রাখা নির্ভর করছে সেই সমাজের অপরিণত নাগরিকদের বিশেষ কতকগুলি আচরণ শেখার উপর। তাছাড়া সমাজের সংরক্ষণ ছাড়া সমাজের উন্নয়নের জন্যও শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। পূর্বপুরুষদের অনুসৃত আচরণগুলি ছাড়াও প্রতি যুগে কিছু কিছু পুরাতন আচরণ অচল বলে পরিত্যক্ত হচ্ছে। এই নতুন আচরণগুলি প্রবর্তন করেন সমাজসংস্কারকেরা, নতুন আদর্শ এবং চিন্তাধারার জনকেরা। অতএব সমাজের অস্তিত্ব এবং অগ্রগতি এই দু'য়ের প্রয়োজনেই কতকগুলি সুনির্বাচিত, সুনির্দিষ্ট এবং সমাজ অনুমোদিত আচরণ প্রত্যেক সমাজেরই ভবিষ্যৎ নাগরিকদের আয়ত্ত করতে হয় এবং এই প্রক্রিয়ারই নাম শিক্ষা। এর জন্য প্রত্যেক সমাজেই আছে কতকগুলি সুসংগঠিত সংস্থা, যেমন পরিবার, স্কুল, কলেজ, ধর্মায়তন এবং ছোটখাট সামাজিক সংগঠন। এগুলির মাধ্যমে অপরিণত নাগরিকদের শেখান হয় বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামাজিক আচরণগুলি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষা বলতে আমরা সেই সব আচরণ আয়ত্ত করা বুঝি যেগুলি ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য এবং যে আচরণগুলি সমাজ-অনুমোদিত কতকগুলি বিশেষ সংস্থার মাধ্যমে সমাজের অপরিণত নাগরিকদের আয়ত্ত করতে সাহায্য করা হয়ে থাকে।

মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষার স্বরূপ

শিক্ষকের মনোবিজ্ঞানে জ্ঞান থাকা দরকার কেন?

মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা উভয়ের প্রকৃত স্বরূপ পর্যালোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, এ দুটি বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত নিকট ও গভীর। মনেবিজ্ঞান হল আচরণের বিজ্ঞান এবং এই বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা প্রাণীর আচরণের ব্যাখ্যা করে থাকি। কেমন করে বিশেষ বিশেষ আচরণ সংঘটিত হয়, কোন্ বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন্ বিশেষ আচরণ সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন আচরণগুলির পেছনে কোনও সর্বজনীন সূত্র পাওয়া যায় কিনা-এই সব তথ্য নির্ণয় করা হল মনোবিজ্ঞানের কাজ। আর সেই আচরণের প্রয়োগমূলক দিকটি হল শিক্ষার বিষয়বস্তু। অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমাজ, উভয়ের দিক দিয়ে অতি প্রয়োজনীয় কতকগুলি বিশেষ আচরণ অপরিণত নাগরিকদের শেখানোই হল শিক্ষার প্রকৃত কাজ। সেদিক দিয়ে মনোবিজ্ঞান যদি হয় আচরণের বিজ্ঞান, শিক্ষা হল আচরণের প্রয়োগশাস্ত্র।

অতএব মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, এমন কি অবিচ্ছেদ্যও বলা চলে। কোন বিশেষ আচরণ শেখাতে হলে সেই আচরণটির স্বরূপ এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা যে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কেবল সহায়ক তাই নয়, অপরিহার্যও সে বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। সেই বিশেষ স্বল্পতম প্রচেষ্টায় সর্বাধিক ফল পাওয়া যাবে ইত্যাদি মূল্যবান তথ্যগুলি জানা থাকলে শেখার কাজটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের পক্ষে নিঃসন্দেহে সহজ হয়ে উঠবে। আর এই প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে শিক্ষার্থীকে কিছু শেখাবার প্রচেষ্টা যে সর্বদাই কষ্টকর এবং প্রায়ই ক্ষতিকর হয়ে থাকে তার প্রমাণ সব দেশেরই শিক্ষার ইতিহাসের

পাতায় পাতায় পাওয়া যাবে।

মনে করা যাক কোন শিক্ষক শিক্ষার্থীকে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা মুখস্থ করাতে চান বা বীজগণিতের কোনও সমীকরণ শেখাতে চান। এখন কবিতা মুখস্থ করতে হলে বা সমীকরণ শিখতে হলে কি ধরণের মানসিক প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হয় এবং কোন্ কোন্ বাহ্যিক ও মানসিক পরিস্থিতি এই সব প্রক্রিয়ার অনুকূল বা প্রতিকূল এই তথ্যগুলি জানা থাকলেই শিক্ষকের প্রচেষ্টা সার্থক হতে পারে নইলে নয়।

টিপ্পনী

প্রাচীন শিক্ষাদান পদ্ধতির সবচেয়ে বড় ত্রুটি ছিল যে সেগুলি মনোবিজ্ঞানভিত্তিক ছিল না। প্রায় ক্ষেত্রেই শিক্ষণ পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হত কতকগুলি ভিত্তিহীন বিশ্বাস এবং কল্পিত ধারণার দ্বারা এবং তার ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়ে উঠত। সত্য বলতে কি আধুনিক মনোবিজ্ঞানের গবেষণার ফল শিক্ষার ক্ষেত্রে যতটা পরিবর্তন এনেছে ততটা অন্য কোন ক্ষেত্রে আনতে পারে নি। শিখনপ্রক্রিয়ার স্বরূপ, মুখস্থ করার উপকারিতা, শাস্তিদানের সার্থকতা, শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা প্রভৃতি শিক্ষাঘটিত বহু সমস্যা সম্বন্ধে প্রাচীন শিক্ষাবিদেরা যে সব ধারণা পোষণ করতেন আজ মনোবিজ্ঞানের গবেষণার ফলে সেগুলি সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। সেই জন্য আজ মনোবিজ্ঞানসম্মত ও সুপ্রমাণিত তথ্যের উপর বর্তমান শিক্ষণ পদ্ধতিকে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা সব দেশেই দেখা দিয়েছে।

সাধারণ ভাবে শিক্ষার তিনটি প্রধান দিক আছে-লক্ষ্য, বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি। শিক্ষার লক্ষ্য কি হওয়া উচিত এই সমস্যার সমাধান করবে দর্শনশাস্ত্র। আমরা দেখেছি শিক্ষা জীবনবিকাশের সঙ্গে সমার্থক। অতএব মানুষের বেঁচে থাকার লক্ষ্যের সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্যও ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। আবার ব্যক্তিমাত্রেরই বেঁচে থাকার লক্ষ্য নির্ভর করে সৃষ্টির বিভিন্ন রহস্য সম্বন্ধে তার জীবনদর্শন কি ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে তার উপর। সেই রকম শিক্ষার বিষয়বস্তুও প্রধানত নির্ভর করে শিক্ষার লক্ষ্যের উপর অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত দর্শনশাস্ত্রের অনুশাসনের উপর।

শিক্ষার পদ্ধতি ও মনোবিজ্ঞান

শিক্ষার পদ্ধতিটি সর্বাংশে নির্ভর করে মনোবিজ্ঞানের উপর। শিক্ষার অর্থ কোন কোন বিশেষ আচরণ আয়ত্ত করা। অতএব শিখন প্রক্রিয়া অপরিহার্য রূপে রয়েছে সব শিক্ষার মূলে। ফলে শিক্ষার সার্থকতা বহুলাংশে নির্ভর করছে শিখন প্রক্রিয়ার কার্যকারিতার উপর এবং সেইজন্য মনোবিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া শিক্ষাদানের কোন কার্যকর পদ্ধতি গড়ে তোলাই সম্ভব নয়।

শিক্ষার লক্ষ্য ও মনোবিজ্ঞান

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়েও মনোবিজ্ঞানের যথেষ্ট প্রভাব আছে। যেমন, যদি কোনও শিক্ষাবিদ্ বলেন যে মানুষের প্রকৃতিদত্ত বাসনাগুলিকে সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে বা বাইরের জগৎ থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণ সরিয়ে এনে সেগুলিকে অন্তর্মুখী করা হল শিক্ষার লক্ষ্য, তাহলে মনোবিজ্ঞান প্রতিবাদ জানিয়ে বলবে যে এ ধরনের লক্ষ্য সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে একান্ত অবাস্তব এবং কখনই তাকে বাস্তবে পরিণত করা যাবে না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু যদিও শিক্ষাশ্রয়ী দর্শনশাস্ত্রের[1] উপর নির্ভর করে, তবুও এগুলি মনোবিজ্ঞানের প্রভাব থেকে

সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। শিক্ষাশ্রয়ী দর্শন শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করে দিলেও দেখতে হবে যে সেই লক্ষ্য শিক্ষার্থীর শিখন ক্ষমতার আয়ত্তাধীন কিনা এবং তা বিচারের ভার শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের উপর। শিক্ষার লক্ষ্য যতই কাম্য এবং দর্শনশাস্ত্রের অনুমোদিত হোক না কেন যদি সেটি শিক্ষার্থীর আয়ত্তের বাইরে হয় তবে সে শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না।

টিপ্পনী

শিক্ষার পরিমাপ ও মনোবিজ্ঞান

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা যতটা না থাকে, যে লক্ষ্যের কতটুকু বাস্তবে রূপায়িত হল এই প্রয়োজনীয় তথ্যটুকু নির্ণয় করতে পারে একমাত্র মনোবিজ্ঞানই। শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীর মানসিক সংগঠনের অভীস্পিত পরিবর্তন ঘটল কিনা, ঘটলে কতটুকু ঘটল এবং সেই পরিবর্তন স্থায়ী কিনা ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে একমাত্র মনোবিজ্ঞানমূলক পরিমাপের সাহায্যেই। শিক্ষার ফল অবশ্য অনেকাংশে উপলব্ধি করা যায় আচরণের পরিবর্তন লক্ষ্য করে। কিন্তু এই পরিবর্তনের নির্ভরযোগ্য ও নির্ভূল পরিমাপ পেতে হলে মনোবিজ্ঞানসম্মত পরিমাপের প্রয়োজন।

শিক্ষার বিষয়বস্তু ও মনোবিজ্ঞান

সাধারণত শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারিত করে শিক্ষার লক্ষ্য এবং শিক্ষার লক্ষ্য বহুলাংশে নির্ভর করে দর্শনশাস্ত্রের উপর। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিক্ষার বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার বিষয়বস্তু যে কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর শিখন ক্ষমতার আয়ত্তাধীন হবে তাই নয়, শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বয়স অনুযায়ী তা বিভক্ত ও বন্টিতও হবে। বিভিন্ন বয়সে শিক্ষার মানসিক যোগ্যতা বিভিন্ন। তাছাড়া রুচি, আগ্রহ, শিখনশক্তি প্রভৃতির দিক দিয়েও শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রচুর পার্থক্য থাকায় শিক্ষার বিষয়বস্তুটিকে সেভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। কোন্ বয়সের পক্ষে কোন্ শ্রেণীর বিষয়বস্তু উপযুক্ত হবে এবং শিক্ষার্থীর ক্রমবিকাশমান দেহ-মনের বৃদ্ধির সঙ্গে কি করে বিষয়বস্তুটিকে সুসংহত করা যাবে এই অতি প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারে একমাত্র মনোবিজ্ঞানই।

পুঁথি থেকে সংগৃহীত মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের সম্পূরক রূপে কাজ করতে পারে একমাত্র সেই জ্ঞানের বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ এবং তা থেকে পাওয়া নতুন নতুন তথ্যাবলী। প্রত্যেক শিক্ষকের উচিত মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করা এবং তার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করা। এ থেকে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যাবে এবং গ্রন্থলব্ধ জ্ঞান অনেক পরিমানে বাস্তবধর্মী হয়ে উঠবে। অর্থাৎ প্রত্যেক শিক্ষককেই একজন ছোটখাট গবেষক হয়ে উঠতে হবে। সমগ্র বিদ্যালয়টি হবে তাঁর গবেষণাগার আর প্রত্যেকটি ছাত্রই হবে তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু।

প্রচীনপন্থী শিক্ষকেরা উপযুক্ত গ্রন্থলব্ধ জ্ঞানকেই সার্থক শিক্ষণের পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করতেন। তার বাইরে আর কিছুর প্রয়োজনীয়তাকে তাঁরা স্বীকার করতেন না। কিন্তু শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার ষিয়বস্তু দুটি, একটি পাঠ্য বিষয় আর একটি ছাত্র নিজে। শিক্ষাবিদ্ অ্যাডামের ভাষায় ইংরেজী 'টিচ' ক্রিয়াপদটির দুটি কর্ম থাকে। একটি শিক্ষার্থী, অপরটি শিক্ষণীয় বিষয়টি। অতএব শিক্ষকের পক্ষে পাঠ্যবিষয়টি জানা যেমন প্রয়োজন, তেমনই শিক্ষার্থীকেও জানা

প্রয়োজন। কেবলমাত্র পাঠ্য বিষয়বস্তুর জ্ঞান থাকলেই চলবে না। যে শিখবে তার সম্বন্ধেও শিক্ষকের পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। এখানেই শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রবেশ ঘটেছে। শিক্ষার্থীকে ভাল করে জানার জন্য মনোবিজ্ঞানে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। অতএব সার্থক শিক্ষার জন্য প্রত্যেক শিক্ষকেরই মনোবিজ্ঞানে জ্ঞান থাকার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের অবদান

টিপ্পনী

আধুনিক শিক্ষা নানা দিক দিয়ে মনোবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। কোন্ কোন্ দিক দিয়ে বর্তমানে শিক্ষাবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের গবেষণার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হল।

১) ব্যক্তিগত বৈষম্য ঃ

সব মানুষ সমান নয়। দৈহিক, মানসিক ও অন্যান্য অনেক দিক দিয়ে মানুষে মানুষে প্রচুর প্রভেদ। ফলে শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতাও অসমান। ব্যক্তিগত বৈষম্যের এই তত্ত্বটি আধুনিক মনোবিজ্ঞানের একটি বড় অবদান। গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এই মূল্যবান মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বটির কোন স্থান ছিল না। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে শিক্ষার্থীর প্রকৃতিগত বৈষম্যের এই তত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষার বিষয়বস্তুটিকে পরিবর্তনশীল ও বৈচিত্র্যময় করা হয়ে থাকে।

২) শিখনপ্রক্রিয়ার নিয়মাবলী ঃ

মনোবিজ্ঞানের ব্যাপক গবেষণার ফলে শিখনপ্রক্রিয়ার স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। জানা গেছে যে সাধারণত আমরা সব বিষয়বস্তু একই প্রক্রিয়ায় শিখি না। বরং শিক্ষণীয় বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী সেগুলি বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিখি। যেমন, জ্যামিতির উপপাদ্য শেখা ও টাইপ করতে শেখা, দুটিই শিখন কার্য হলেও শিখনের পদ্ধতি উভয়ক্ষেত্রে বিভিন্ন। এখন শিক্ষক যদি শিখন পদ্ধতির এই বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে পরিচিত থাকেন তবেই তাঁর শিক্ষণকার্য সফল হতে পারে। নতুবা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই শ্রমের অকারণ অপচয় হতে বাধ্য।

৩) ব্যক্তিসত্তার বহুমুখী ক্রমবিকাশের নিয়মাবলী ঃ

শিক্ষা ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশের সমার্থক। নবজাতকের দেহ, মন, বুদ্ধি, অনুভূতি, সামাজিক চেতনা প্রভৃতি থাকে নিতান্ত অপরিণত অবস্থায়। কিন্তু সময়ের অতিক্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে এর প্রত্যেকটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং যথাসময়ে পূর্ণতালাভ করে। মনোবিজ্ঞানের গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকের বিকাশের ধারা ও গতি এক তো নয়ই বরং এদের প্রত্যেকটির একটি নিজস্ব ভঙ্গী ওবং পথ আছে। শিশুর শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে এই বিভিন্ন বিকাশভঙ্গীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তার শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

টিপ্পনী

৪) বুদ্ধির প্রকৃতি ও পরিমাপ ঃ

শিক্ষা প্রক্রিয়ায় দ্রুততা এবং সাফল্য দুইই বহুলাংশে নির্ভর করে শিক্ষার্থীর বুদ্ধির উপর। দেখা গেছে যে সব কিছু শেখা, বিশেষ করে চিন্তামূলক কোন কিছু শেখা, নির্ভর করে শিক্ষার্থীর বুদ্ধির মাত্রা বা পরিমাণের উপর। মনোবিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণা থেকে বুদ্ধির প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে বর্তমানে এই বুদ্ধি পরিমাপ করার নির্ভরযোগ্য পন্থাও আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলে শিক্ষাদানের অনেক জটিল সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করা এখন সম্ভব হয়ে উঠেছে।

৫) মনোযোগ দেওয়া, মনে রাখা, ভুলে যাওয়া প্রক্রিয়াবলী ঃ

মনোবিজ্ঞানের ব্যাপক গবেষণার ফলে মনোযোগ দেওয়া, মনে রাখা, ভুলে যাওয়া ইত্যাদি ব্যক্তির বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে নানা প্রয়োজনীয় তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। এই তথ্যগুলি বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিকে বিজ্ঞানসম্মত করে তুলতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

৬) সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের গুরুত্ব ঃ

ব্যক্তির সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের সঙ্গে শিক্ষার একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। শিক্ষার্থীর বহু আচরণের উপর তার বিভিন্ন প্রবৃত্তির প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং এই প্রবৃত্তিগুলির স্বরূপ ও নিয়ন্ত্রণক্ষমতা সম্বন্ধে শিক্ষকের যথাযথ জ্ঞান না থাকলে শিক্ষণকার্য অপচয়বহুল হতে বাধ্য। তেমনই শিক্ষার সুষ্ঠু সম্পাদন শিক্ষার্থীর অনুকূল প্রক্ষোভের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। আধুনিক মনোবিজ্ঞান ব্যক্তির প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ সম্বন্ধে নানা নতুন তথ্যের আবিষ্কার করে শিক্ষাকে অধিকতর সার্থক ও সফল করে তুলেছে।

৭) গণ-মনোবিজ্ঞান ঃ

গণ-মনোবিজ্ঞানের নানা সূত্র আজকাল শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে। দেখা গেছে যে এককভাবে ব্যক্তির আচরণের সঙ্গে তার দলগত আচরণের নানা দিক দিয়ে পার্থক্য আছে। আধুনিক শিক্ষাদান প্রথা দলমূলক, ব্যক্তিমূলক নয়। ফলে স্বভাবতই দলগত মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ শিক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

৮) সঙ্গতিবিধানঘটিত সমস্যা ঃ

সঙ্গতিবিধানমূলক সমস্যাদির সমাধান করা সুষ্ঠু শিক্ষণ কার্যের প্রথম সোপান। সঙ্গতিবিধানের সমস্যা প্রধানত দেখা দেয় যখন শিশু তার পরিবেশের সঙ্গে কোন কারণে খাপ খাইয়ে নিতে অসমর্থ হয়। এই ধরনের শিশুকে অপসঙ্গতিসম্পন্ন বলা হয়। যে সব শিক্ষার্থী তার পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করতে পারে না তাদের শিক্ষাদান করা সব দিকে দিয়ে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এই ধরনের সঙ্গতিবিধানমূলক সমস্যাদি বহু প্রয়োজনীয় তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে।

৯) মনোবিজ্ঞানভিত্তিক পরিমাপ যন্ত্র ঃ

মনোবিজ্ঞানভিত্তিক পরিমাপ যন্ত্রগুলি হল সাম্প্রতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। দীর্ঘ গবেষণার ফলে বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্যগুলি পরিমাপ করার বহু নির্ভরযোগ্য যন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছে। তার ফলে আজকাল বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নানা সহজাত ও অর্জিত বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ করা হয়েছে। গতানুগতিক ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতির স্থানে বিজ্ঞানসম্মত নানা প্রকৃতির শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষা[1] উদ্‌ভাবিত হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণ[2],আগ্রহ[3], মনোভাব[4] প্রভৃতি পরিমাপ করারও যন্ত্র আজকাল আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির যথাযথ ব্যবহার যে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে যথেষ্ট উন্নত করে তুলেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

টিপ্পনী

১.৫ বিকাশের স্তর পরম্পরা (Stage of development) ঃ

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং মনস্তত্ত্ববিদরা একজন ব্যক্তির জীবনে বিকাশের স্তর পরম্পরা বিভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন। এই বিভিন্ন স্তর পরম্পরায় শিশুরা ভিন্নভাবে আচরণ করে থাকে। এ ব্যাপারে Roussean, Erikson এবং Piaget মতবাদ উল্লেখযোগ্য। Roussean-র মতে স্তর পরম্পরা নিম্নরূপ ঃ-

স্তর	আনুমানিক বয়স	বৈশিষ্ট্য
১. শৈশব (Infaney)	১ থেকে ৫ বছর	১) স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াবার স্তর ২) সহী খেলনা নিয়ে খেলা ৩) শারীরিক বিকাশ
২. কৈশর (Childhood)	৫ থেকে ১২ বছর বয়স	১) ইন্দ্রিয়ের বিকাশ ২) কোন শাজিক অনুশীলন নয় ৩) ক্রিয়াশীলতা এবং অভিজ্ঞতা
৩. প্রাক বয়ঃসন্ধিক্ষণ	১২ থেকে ১৫ বছর	১) শিশুর বিকাশ ২) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অধ্যয়ন ৩) মানসিক ও কায়িক শ্রম
৪. বয়সন্ধিক্ষণ	১৫ থেকে ২০ বছর	১) যৌন প্রশিক্ষণ ২) কাজের মধ্য দিয়ে নৈতিক শিক্ষা ৩) জটিল সামাজিক সম্পূর্ণ বোঝা

দ্রষ্টব্য ঃ বালিকাদের বিকাশ নিম্নভাবে হয় -

Iean Piaget (1896-1980) নির্দেশিত বিকাশের ৪টি স্তর ঃ

স্তর	বয়স	বৈশিষ্ট্য
১) ইন্দ্রিয় সঞ্চয়নমূলক স্তর	খাবার বয়স থেকে ২ বছর	পরিবেশে বস্তুসমূহের মধ্যে বৈচিত্র্য অধ্যয়ন

টিপ্পনী

২) প্রাক্ সক্রিয়তা স্তর	২ বছর থেকে ৬ বছর	শব্দকোষ আয়ত্ত করতে দেখে শিশু
৩) মূর্ত্ত সক্রিয় স্তর	৬ বছর থেকে ১১/১২ বছর	শিশু যোগ, বিয়োগ ও গুণ করতে দেখে
৪) প্রগতি সক্রিয় স্তর	১১ বছর থেকে ১২ বছর	শিশু যুক্তিসম্মত ভাবে চিন্তা করতে দেবে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে Piaget-এর চিন্তাধারার তাৎপর্য বিশেষজ্ঞদের উপদেশের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

১.৬ বয়ঃসন্ধিক্ষণ (Adolesence) ঃ

এটা মানুষের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাল। শৈশব থেকে বয়স্ক প্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত যে বছরগুলো তাকে তিনটি স্তরে ভাগ করতে পারা যায় - ১১ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত প্রথম দিকের বয়ঃসন্ধিক্ষণ (early adolesence), মধ্য বয়ঃসন্ধিক্ষণ হল ১৫ বছর থেকে ১৭ বছর পর্যন্ত আর ১৮ থেকে ২০ বছর পর্যন্ত বয়ঃসন্ধিক্ষণের সমাপ্তি। এই যে বয়ঃসন্ধিক্ষণের ব্যাপ্তি তার মধ্যে পড়ে বিভিন্ন রকমের বিকাশ যেমন শারীরিক, বৌদ্দিক (intelleating) ইত্যাদি।

এক শতাব্দী আগে G. S. Hale বয়ঃসন্ধিক্ষণের উপর বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং এর বৈশিষ্ট্য বিশদে আলোচনা করেন। তাঁর মতে "বয়ঃসন্ধিক্ষণ হল নূতন জন্ম কারণ উচ্চতর এবং সম্পূর্ণরূপ মানবীয় প্রলক্ষণ দেখা দেয় বিকাশ ক্রমিক নয়...." ("Adolesence is a new birth for the higher and more completely human fraits are now born .... Development is has gradnal....")

কিন্তু আমরা কি জানি যে Hale এর পরবর্ত্তী সময়ে অর্থনৈতিক (economic), রাজনৈতিক, ধর্মীয় (religion) এবং সামাজিক আবহের বহুল পরিবর্তন এসেছে। অধিকন্তু, বেতার (radio) এবং দূরদর্শন ছাড়াও নূতন সামাজিক বন্ধন (social networking) এর রাস্তা খুলে গেছে।

উপরে যা কিছু বলা হল তা থেকে বয়ঃসন্ধিক্ষণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো ধরা পড়ল -

- ব্যক্তি জীবনে বয়ঃসন্ধিক্ষণ হল একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়
- দ্রুত যুগান্তকারী পরিবর্তনের সময় হল বয়ঃসন্ধিক্ষণ
- বয়ঃসন্ধিক্ষণ হল প্রথম একটা কাল যখন ব্যক্তিত্বের বিকাশ নানা ভাবে হয়।
- এই সময়ে নূতন শিখব (learning) শুরু হয়
- এই সময় চিন্তাভাবনা শুরু হয়

বয়ঃসন্ধিক্ষণ হল দ্বন্দ্ব ও জটিলতার সময়।

ও আরও অনেক বৈশিষ্ট্য এই বয়ঃসন্ধিক্ষণ সম্বন্ধে নানা মতবাদ রয়েছে, যেমন Hale এর Anna Freud এর, Iulhvan এর এবং Erickson এর। মনোবিদ S. Hall এই বয়সের বৈশিষ্ট্য বোঝাবার জন্য একটি সুন্দর ইংরাজি পদ ব্যবহার করেছেন - 'Flapper'। যে পাখির পাখনার পরিপূর্ণ বিকাশ হয় নি, তবুও বাসার থেকে ওড়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। এ রকম নানা বিদেক্ষণে এদের ভূষিত করা হয়েছে। কিন্তু কৈশোর বলতে ঠিক কী বোঝায় তা পরিষ্কার ভাবে। এ সব কিছু থেকে বোঝা যায় না।ইংরাজি 'Adolescence' শব্দটি Latin শব্দ 'Adoleseere' থেকে এসেছে।এর অর্থ হল পরিণমনের পথে বিকাশ (to grow into maturity)।এই অর্থে কৈশোর এক ধরণের প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজ উপযুক্ত জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল। অনেকে কৈশোর কে দৈহিক বিকাশের একটি স্তর হিসাবে বিবেচনা করেছেন।

আধুনিককালে কৈশোরের তাৎপর্য্য সামাজিক দিক থেকে বিবেচনা করা হয়।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যে সমস্ত শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে তাদের বড় অংশই কৈশোরের স্তরের অন্তর্গত। এই জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা বিশেষভাবে এই স্তরের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে হবে। এই বয়সের ছেলে মেয়েদের স্বাভাবিক বিকাশের ধারা যাতে কোনোরকম ভাবে ব্যাহত না হয় সেদিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। কিশোর-কিশোরীরা (Adolescents) যাতে তাদের সকল রকম সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে পারে, সেই অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিচালিত করতে হবে। শিক্ষার দ্বারা আমরা এই সব ছেলে মেয়েদের প্রত্যক্ষ্য সমস্যার সমাধানে যদি সাহায্য করতে না পারি তাহলে মাধ্যমিক শিক্ষার কোনো তাৎপর্যই থাকবে না। তাই বিদ্যালয়ে শিক্ষক, পরিচালক এবং সব শিক্ষাকর্মীকে এদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। কিশোর-কিশোরীদের জীবন বিকাশে সহায়তা করার জন্য এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সাহায্য করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি নজর দিতে হবে। যেমন -

ক) দৈহিক বিকাশের প্রতি সহানুভূতি ঃ কৈশোরে আমরা লক্ষ্য করেছি শিক্ষার্থীদের দৈহিক বিকাশ প্রচুর পরিমানে হয়। এই দৈহিক বিকাশ তাদের মধ্যে দু-রকমের সমস্যার সৃষ্টি করে। দেহের বিভিন্ন অংশের বৃদ্ধির ফলে অনেক সময় লজ্জার ভাব দেখা যায়। তাদের দৈহিক পরিবর্তনকে তারা অনেক সময় লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। তাঁরা যেন এই ধরনের আচরণকে প্রশ্রয় না দেন। তাঁরা যেন উন্মুক্ত মন নিয়ে তাদের এই পরিবর্তনগুলোকে গ্রহণ করেন। তাদের সঙ্গে এমন ভাবে আচরণ করা দরকার, যার ফলে তারা এই সব দৈহিক পরিবর্তন সম্পর্কে কম সচেতন হয়। অন্যদিকে এই সব দৈহিক পরিবর্তন জনিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে অধিক পরিমানে দেহ-সঞ্চালনের তাগিদ দেখা যায়। তাদের এই বৃদ্ধির ধারার অনুকূল বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলো, ব্যায়ামের ব্যবস্থা করতে হবে। এই সময় দৈহিক বিকাশের ফলে বিভিন্ন দেহ মন্ত্রের কাজের পরিবর্তন হয়। পুষ্ঠিকর খাদ্য এই সময় একান্ত প্রয়োজন। তাই শিক্ষক এবং পিতা-মাতার এদিকে নজর রাখা উচিত।

খ) জ্ঞানের চাহিদার তৃপ্তি ঃ জ্ঞানের চাহিদাকে চরিতার্থ করার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সব রকম প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরী থাকবেন। কৌতুহলের জন্য তারা অনেক কিছু বিশদে জানতে চায়। কোনো বিষয়ে আবছা ধারণা গ্রহনে তারা ইচ্ছুক থাকে না। তাই বিশেষ কোনো

টিপ্পনী

সমস্যা তাদের সামনে এলে সমাধানের সময় শিক্ষক ঐ সমস্যার গভীরে প্রবেশ করবেন। সমস্যার বিভিন্ন দিক্ বিশ্লেষন করে তাদের সামনে উপস্থাপন করবেন। এই বয়সে বুদ্ধির পরিপূর্ণ বিকাশ হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের বিচার বিবেচনার ক্ষমতা বাড়ে, ফলে তারাও খুব বেশী সমালোচনা প্রবন (Critical) হয়ে পড়ে। তাদের এই মনোভাবের যোগ্য মর্যাদা বিদ্যালয়ের দিতে হবে।

গ) নৈতিক চাহিদার বিকাশ ঃ এই বয়সে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক চাহিদা দেখা দেয়। এই সব নৈতিক মূল্যবোধকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করতে হবে। শিক্ষক যেন কোনো সময় এর বিরুদ্ধাচরণ না করেন। তিনি যদি এর বিরুদ্ধাচারণ করেন, তাহলে শিক্ষার্থীরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করবে এবং শিক্ষকের প্রতি তাদের বিরূপ মনোভাব দেখা দেবে। শিক্ষকের নিজস্ব মূল্যবোধ শিক্ষার্থীদের এ ব্যাপারে সহায়তা করবে। তিনি যদি নৈতিক আদর্শের অধিকারী হন তবেই তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে নীতিবোধ জাগাতে পারবেন।

টিপ্পনী

ঘ) মুখবদ্ধতার নিয়ন্ত্রণ ঃ কিশোর-কিশোরীরা যৌথ প্রবৃত্তির তাড়নায় এবং তাদের বিভিন্ন নতুন নতুন চাহিদার তাড়নায় দল গঠন করে। তারা এই চাহিদার বশবর্ত্তী হয়ে যাতে খারাপ সঙ্গে না মেশে, সেদিকে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই বয়সে শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধ ভাবে কাজ করতে এবং খেলা করতেও ভালবাসে। তাদের এই চাহিদাকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষক শিক্ষণের কাজকেও সহজতর করে তুলতে পারেন। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উৎসব বা অনুষ্ঠান পরিচালনায় ভার তাদের ওপর দলগত ভাবে দিলে তারা এই চাহিদার পরিতৃপ্তি করতে পারে।

ঙ) যৌনশিক্ষা ঃ যৌন জীবনের বিকাশ এই বয়সের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যৌন চাহিদার মূলে আছে সৃজনী স্পৃহা। তাদের এই যৌন চাহিদার যাতে যথাযথ উদগমন (sublimation) হয়, তার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা শিক্ষককে অবলম্বন করতে হয়। তিনি যেন যৌন চাহিদার সঙ্গে যুক্ত সৃজনী স্পৃহাকে যে কোনো ধরণের সৃজনাত্মক কাজের মধ্যে প্রয়োগ করার সুযোগ করে দেবেন। যেমন ছবি আঁকা, সাহিত্য রচনা, অভিনয় ইত্যাদি কাজের সুযোগ দিয়ে এই চাহিদার পরিতৃপ্তি আনতে পারেন। যৌন চাহিদার সঙ্গে যৌন কৌতূহলও আসে এবং সাধারণত এই কৌতূহলকে ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় বিদ্যালয়ে। কিন্তু তাতে ফল খারাপই হয়। তাই এই যৌন কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য উপযুক্ত যৌন শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

যৌবনাগম

যৌবনাগমের শুরু যৌন পরিণতিতে। যৌন পরিণতি বলতে ছেলেদের ক্ষেত্রে বীর্যোৎপাদন ও মেয়েদের ক্ষেত্রে রজঃসৃষ্টি বোঝায়। ছেলেমেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই এই সময় যৌন ইন্দ্রিয়ের পূর্ণতালাভ ঘটে ও দেহে নানারূপ যৌনসূচক চিহ্নের আবির্ভাব হয়। এগুলিকে গৌণ যৌন চিহ্ন বলা হয়।

পীড়ন ও কষ্টের কাল

কি ছেলে কি মেয়ে উভয়ের জীবনেই যৌবনাগম নানাদিক দিয়ে একটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কোন কোন প্রাচীন মনোবিজ্ঞানী এই সময়কে পীড়ন ও কষ্টের কাল বলেও বর্ণনা করেছেন। আবার কেউ কেউ এই সময়টিকে অপরাধপরায়ণতার কাল বলে বর্ণনা করে থাকেন। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা কিন্তু এ ধরনের চরমধর্মী বর্ণনাকে সম্পূর্ণ অতিরঞ্জন বলে মনে করে থাকেন।

তবে একথা সত্য যে যৌবনাগম ব্যক্তির জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ সময় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন প্রাপ্তযৌবনদের জীবনে দেখা দেয় এবং এগুলি তার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিসত্তার প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে বিরাট করে থাকে।

সঙ্গতিবিধানের সমস্যা

যৌবনাগমকে আর্নেস্ট জোনস শৈশবের পুনরাবৃত্তি বলে বর্ণনা করেছেন। শৈশবে দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভগত ও যৌনমূলক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে এক চরম অসংহতি ও বিশৃঙ্খলা দেখা যায়, বাল্যকাল ও কৈশোরের আগমনে সে অসংহতি ও বিশৃঙ্খলা ধীরে ধীরে লোপ পায় এবং শিশু অত্যন্ত সন্তোষজনকভাবে তার পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। কিন্তু যৌবনের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই শৃঙ্খলা ও সংহতি আকস্মিকভাবে আবার লোপ পেয়ে যায় এবং ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভগত ও যৌনমূলক জগতে এক বিরাট বিপর্যয় দেখা যায়। শৈশবে যেমন তাকে এক নতুন জগতের অপরিচিত শক্তিগুলির সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধান করার জন্য প্রয়াস করতে হয়েছিল। যৌবনাগমেও সেইভাবে আবার তার চারপাশের পৃথিবীর সঙ্গে নতুন করে সঙ্গতিবিধানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। শৈশবে যেমন নতুন পরিবেশের সঙ্গে ঠিক মত সঙ্গতিবিধান করতে না পারার জন্য বার বার তাকে অসুবিধা ও ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যৌবনাগমেও তেমনি তার পুরাতন ও পরিচিত পরিবেশের সঙ্গে সন্তোষজনক সঙ্গতিবিধানের অসামর্থ্যের জন্য তাকে প্রতিপদে ব্যর্থতা, লজ্জা ও হতাশা বরণ করতে হয়। এই দিক দিয়ে শৈশবের সঙ্গে যৌবনাগমের একটা খুব বড় মিল আছে।

টিপ্পনী

আকস্মিক দৈহিক পরিবর্তন

যৌবনাগমে ছেলেমেয়েদের মধ্যে এক সর্বাঙ্গীন পরিবর্তন দেখা দেয়। এই সময় ছেলেমেয়ে উভয়েরই দেহে আকস্মিকভাবে এমন কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে যেগুলি পরিবার বা বাইরের আর সকলের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করে। অনেক ক্ষেত্রে বয়ঃপ্রাপ্তরা ছেলেমেয়েদের এই দৈহিক পরিবর্তনগুলিকে ভালভাবে নেন না এবং কখনও কখনও সেগুলি নিয়ে উপহাস, বিদ্রূপ এবং বিরূপ মন্তব্যও করেন। তার ফলে যৌবনপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের মনে একটা অস্বাচ্ছন্দ্যময় ও অস্বস্তিকর মনোভাব দেখা দেয় এবং তাদের আচরণ সঙ্কোচপূর্ণ ও আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। এর ফলে অনেক সময় তারা গুরুতর মানসিক আঘাত পায় এবং আত্মরক্ষার জন্য বাস্তব থেকে নিজেদের অপসৃত করে নেয়।

মানসিক শক্তিসমূহের পরিণতি

বুদ্ধি ও মানসিক শক্তির দিক দিয়ে যৌবনপ্রাপ্তির সময় ছেলেমেয়েদের মনে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে না। তবে এই সময় বিভিন্ন মানসিক শক্তিগুলি তাদের সহজ বুদ্ধি প্রচেষ্টার ফলে পূর্ণতা লাভ করে। ফলে মননশক্তি, বোধশক্তি, বিচারশক্তি ইত্যাদি মানসিক শক্তিগুলির দিক দিয়ে ছেলেমেয়েরা পরিণত ব্যক্তির সমকক্ষ হয়ে ওঠে। এই নবলব্ধ শক্তিগুলি সম্বন্ধে তাদের মনে সচেতনতা দেখা দেয় এবং পরিবার বা সমাজের আর দশ জনের মত তারাও ছোট-বড় সমস্যার সমাধানে নিজেদের অভিমত নিয়ে এগিয়ে আসে। কিন্তু সাধারণত তাদের এ হস্তক্ষেপকে অনেক পরিণত ব্যক্তিই অকালপক্কতা বলে মনে করেন এবং ধমক দিয়ে তাদের

দূরে সরিয়ে দেন বা অগ্রাহ্য করেন। তার ফলে এই ছেলেমেয়েরা নিজেদের অবহেলিত বলে মনে করে এবং তাদের মধ্যে সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধেই একটা বিদ্রোহের ভাব দেখা দেয়।

বিরাট প্রক্ষোভগত পরিবর্তন

টিপ্পনী

প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে সব চেয়ে বড় পরিবর্তন দেখা দেয় তাদের প্রক্ষোভের রাজ্যে। বলতে গেলে সেখানে একটা ছোটখাটো বিপ্লব ঘটে যায়। দেহের আকস্মিক পরিবর্তন, যৌন পরিণতি, মানসিক শক্তির পূর্ণতা লাভ, বাইরের জগতের উপর এগুলির প্রতিক্রিয়া, এসবে মিলে প্রাপ্তযৌবনের মনে একটি বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং তার এতদিনের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রক্ষোভের সংগঠনটি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। নিজের বহুমুখী পরিপূর্ণতার নতুন উপলব্ধিতে যেমন একদিক দিয়ে তার মনে এক অনাস্বাদিত আনন্দ দেখা দেয় তেমনই তার সামর্থ্য ও প্রয়োজনের প্রতি সমাজের উদাসীনতা ও অবহেলা তার মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। এর ফলে অধিকাংশ প্রাপ্তযৌবনকেই অন্তর্মুখী বা আত্মকেন্দ্রির হয়ে উঠতে দেখা যায়।

নিপীড়ন ও বিদ্রোহের মনোভাব

বয়স্কদের অবহেলার ফলে এই সময় বাইরের জগতের প্রতি প্রাপ্তযৌবনদের মনে একটা বিক্ষোভের ভাব জাগে এবং অনেকেই মনে করে যে তার প্রতি যথেষ্ট সুবিচার করা হচ্ছে না, বরং সকলে মিলে অন্যায়ভাবে তাদের নিপীড়ন করছে। পরিবার বা সমাজের অন্যান্য বয়স্ক লোকেরা প্রাপ্তযৌবনদের এই বিশেষ চিন্তাধারা অনুসরণ করতে না পেরে অনেক সময় তাদের প্রতি সত্যিই যথেষ্ট অবিচার করে থাকেন এবং তার ফলে তাদের মধ্যে এক ধরনের নিপীড়নমূলক মনোভাব তীব্র হয়ে ওঠে।

এই নিপীড়নমূলক মনোভাব থেকেই প্রাপ্তযৌবনের মধ্যে জন্ম নেয় বিদ্রোহের প্রবণতা। সহজেই কোন কিছু স্বীকার করতে বা মেনে নিতে সে চায় না। তার পরিণত বুদ্ধি ও উন্নত মননক্ষমতা তাকে জোগায় তার বিদ্রোহের পেছনে আত্মবিশ্বাস। সে প্রচলিত বিশ্বাস, রীতিনীতি, ধর্মীয় বা সামাজিক মান প্রভৃতি সবেরই বিরোধীতা করে। সে নিজে সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করতে চায়। তবে সমাজের যা কিছু প্রাচীন, যা কিছু প্রতিষ্ঠিত সে সব ভাঙ্গার মধ্যেই তার আনন্দ সীমাবদ্ধ থাকে, নতুন করে কিছু গড়ার প্রতি তখন তার তেমন আগ্রহ দেখা যায় না।

যৌনতার পূর্ণ বিকাশ

যৌবনপ্রাপ্তিতে যৌনতা পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। সেইজন্য প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা প্রাপ্তযৌবনদের ক্ষেত্রে যৌ চাহিদাকে খুব বড় স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আধুনিক পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে এ সময় সত্যকারের যৌন চাহিদা তেমন কিছু অস্বাভাবিক বা তীব্র রূপ ধারণ করে না। বরং এই সময় যৌনঘটিত আকস্মিক শারীরিক পরিবর্তনগুলি ছেলেমেয়েদের কাছে মধুর বিস্ময়রূপে দেখা দেয় এবং তাদের যৌনচাহিদা মূলত প্রণয়ঘটিত কল্পনা ও চিন্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। গভীর ভাববিলাসময় ও আবেগপূর্ণ প্রেমের নানা ঘটনা এ সময় ছেলেমেয়েদের জীবনে প্রায়ই ঘটে থাকে।

যৌনকৌতুহল এ সময় তীব্রতর আকার ধারণ করে এবং যৌনঘটিত রহস্য জানার

জন্য প্রাপ্তযৌবনদের আগ্রহের সীমা থাকে না। কিন্তু অধিকাংশ দেশেই যথোপযুক্ত যৌনশিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় প্রাপ্তযৌবনদের সেই কৌতুহল হয় অতৃপ্ত থেকে যায়, নয় অবাঞ্ছিত স্থান থেকে তাদের অর্ধসত্য ও বিকৃত সত্য আহরণ করতে হয়। তার ফলে তাদের ভবিষ্যৎ যৌনজীবন অনেক ক্ষেত্রে ভ্রান্তিপূর্ণ ও সমস্যাজটিল হয়ে ওঠে।

অবাস্তব কল্পনা ও দিবা-স্বপ্ন

যৌবনপ্রাপ্তির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল অবাস্তব কল্পনা ও দিবা-স্বপ্নের আধিক্য। সর্বতোমুখী পরিণতি প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে যে সকল নতুন চাহিদার সৃষ্টি করে সেগুলি সব বাস্তবে তৃপ্তি লাভ করতে পারে না। ফলে সে সেগুলিকে পূর্ণ করতে দিবা-স্বপ্ন ও অলীক কল্পনার সাহায্য নেয়। প্রাপ্তযৌবনদের দিবা-স্বপ্ন বিশ্লেষণ করলে দু'শ্রেণীর স্বপ্ন পাওয়া যায়, প্রথম আত্মপ্রতিষ্ঠামূলক বা আত্মগৌরবমূলক স্বপ্ন। যেমন, প্রাপ্তযৌবন স্বপ্ন দেখে যে সে পড়াশোনায় প্রথম হচ্ছে বা খেলায় সব চেয়ে সেরা স্থান অধিকার করছে বা কোন দুঃসাহসিক কাজ করছে ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বপ্ন হচ্ছে প্রণয়মূলক। যেমন, সে তার আকাঙ্খিত প্রণয়ী বা প্রণয়িনীকে লাভ করেছে। প্রাপ্তযৌবনদের অধিকাংশ দিবা-স্বপ্নই তীব্র প্রক্ষোভে নিষিক্ত থাকে এবং এই ধরনের অলীক-কল্পনার সাহায্যে সে তার অতৃপ্ত প্রক্ষোভের তৃপ্তিসাধন করে। সে দিক দিয়ে প্রাপ্তযৌবনদের ক্ষেত্রে দিবা-স্বপ্নের যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। এগুলি প্রাপ্তযৌবনদের মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন রাখতে সাহায্য করে এবং তাদের প্রাক্ষোভিক সাম্য বজায় রাখে। কিন্তু অতিরিক্ত ও অতি-অবাস্তব দিবা-স্বপ্ন সুষ্ঠু ব্যক্তিসত্তা বিকাশের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায় সে কথাও খুবই সত্য।

টিপ্পনী

প্রাপ্তযৌবনদের চাহিদা ও সমস্যা

যৌবনাগমের সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্তযৌবনদের দেহে, মনে, চিন্তায়, ধারণায় ও অনুভূতিতে, এক কথায় তাদের সমগ্র সত্তার মধ্যে প্রচন্ড পরিবর্তন দেখা দেয়। এই বহুমুখী পরিবর্তন তাদের পূর্বতন সঙ্গতিবিধানের সমস্ত পন্থাকে অক্ষম করে তোলে এবং তাদের ক্ষেত্রে তখন পরিবেশের সঙ্গে নতুন করে আবার সঙ্গতি-বিধান করার প্রয়োজন হয়। তাদের নিজেদের চাহিদার মধ্যেও এই ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয়। এই সব নানা পরিবর্তনের ফলে তাদের দৈহিক, প্রক্ষোভমূলক ও চিন্তামূলক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকৃতির নতুন নতুন চাহিদার সৃষ্টি হয়। বাল্যকালে তাদের চাহিদা মূলত শারীরিক ও কতকগুলি সরল মানসিক চাহিদায় সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু যৌবনাগমে তাদের মনের রাজ্যের আরও অনেক নতুন নতুন দরজা খুলে যায়। ধর্মাধর্ম, বৃহত্তর সমাজের আবেদন, ভালমন্দের বিচার, যৌনস্পৃহা, জীবনরহস্য সম্পর্কে কৌতুহল, নতুন নতুন ধারণা ও অনুভূতি তাদের মনকে পরিপ্লাবিত করে তোলে এবং তাদের মধ্যে নব নব চাহিদা উত্তুঙ্গ তরঙ্গের সৃষ্টি করে।

প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে সমস্যা তখনই দেখা দেয় যখন তাদের এই নব অনুভূত চাহিদাগুলি বাস্তবে অতৃপ্ত থেকে যায়। আমাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় তাদের এই সব চাহিদা পুরাতন পরিচিত পরিবেশে সাধারণত তৃপ্ত হবার কোন সুযোগ পায় না। ফলে তাদের মধ্যে দেখা দেয় অতৃপ্তি এবং সেই অতৃপ্তি থেকে সৃষ্টি হয় অপসঙ্গতি। অপসঙ্গতি বলতে বোঝায় পরিবেশের সঙ্গে সুসঙ্গতিবিধানের অসামর্থ্য। প্রাপ্ত-যৌবনদের চারপাশে যে সব বিভিন্নধর্মী শক্তি আছে

সেগুলির সঙ্গে তারা ঠিকমত মানিয়ে নিতে পারে না এবং এই অপসঙ্গতি থেকেই তাদের মধ্যে জন্মায় নানারকম অবাঞ্ছিত প্রবণতা, দুষ্কৃতিপরায়ণতা এবং সমস্যামূলক আচরণ।

স্ট্যানলী হল, হলিংওয়ার্থ প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা প্রাপ্তযৌবনদের চাহিদা নিয়ে বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ করে তাদের চাহিদাগুলির নানা বিবরণী দিয়েছেন। তাঁদের সেই সব পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে এবং প্রাপ্তযৌবনদের বিভিন্ন পরিবর্তনের গুরুত্ব বিচার করে তাদের প্রধান প্রধান চাহিদাগুলির একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল। যথা–

টিপ্পনী

১) মুক্ত সক্রিয়তার চাহিদা

এই সময় ছেলেমেয়েদের সর্বদেহে একটা আকস্মিক বৃদ্ধি দেখা দেয়। এই দৈহিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত সক্রিয়তার সুযোগ এবং মুক্ত বাতাস ও রোদে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবাধ সঞ্চালনের অবকাশ। খেলাধূলা, দৌড়ঝাঁপ, ভ্রমণ, পিকনিক ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাপ্তযৌবনদের এই মূল্যবান চাহিদাটির তৃপ্তি হতে পারে। সেইজন্য মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিভিন্ন প্রকৃতির সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর অন্তর্ভূতি মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে অপরিহার্য বলে পরিগণিত হয়েছে।

২) স্বাধীনতার চাহিদা

যৌবনপ্রাপ্তিতে যে চাহিদাটি ছেলেমেয়েদের মনে সর্বপ্রথম দেখা দেয় সেটি হল আত্মনির্ভরতার চাহিদা। জন্মাবধি তারা সব দিক দিয়ে পরের উপর নির্ভরশীল ছিল, কিন্তু আজ সেই পরনির্ভরতা থেকে তারা মুক্তি খোঁজে এবং সমাজের স্বাধীন সদস্য রূপে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে চায়। সে নিজে থেকেই নানা গুরুকর্মের দায়িত্ব বহন করতে এগিয়ে আসে, পরিবারের সাধারণ সমস্যা সম্বন্ধে মতামত দেয় এবং কোন কাজের ভার পেলে আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে তা সম্পন্ন করে। ছেলেমেয়েদের এই স্বাধীনতার আকাঙ্খা তাদের মনের স্বাভাবিক পরিণতির ফল। মনের বিভিন্ন দিকের পূর্ণতা থেকেই তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা জাগে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার আগ্রহ দেখা দেয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজের বয়ঃপ্রাপ্তরা প্রাপ্তযৌবনদের এই মনোভাবকে ভালো চোখে দেখেন না। ফলে সংঘর্ষ অপরিহার্য হয়ে ওঠে এবং তাই থেকে ছেলেমেয়েদের মধ্যে নানারকম আচার–বৈষম্য দেখা দেয়।

৩) সমাজজীবনের চাহিদা

যৌবনাগমের পূর্বে শিশু বৃহত্তর সমাজ সম্পর্কে একান্তই উদাসীন ছিল। তার নিকটতম পরিবেশ ছাড়া তার আগ্রহ দুরতর ক্ষেত্রে বিস্তৃত হত না। কিন্তু যৌবনাগমে তার মনের দরজায় বৃহত্তর পৃথিবীর নান আবেদন এসে পৌছায়। নিজের ক্ষুদ্র পরিবেশের গন্ডীর বাইরে মানব সমাজের সঙ্গে একাত্মতার এক অনুভূতি তার মনকে স্পর্শ করে। সে অপরের সঙ্গ খোঁজে, অপরিচিতের সঙ্গে পরিচিত হয়, নিজের স্বাধীনতা স্বেচ্ছায় গোষ্ঠীর স্বার্থে বিলিয়ে দেয়। স্কুল, ক্লাব, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন প্রভৃতি নানাবিধ যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে প্রাপ্তযৌবনদের এই সমাজ জীবনের চাহিদাটি তৃপ্ত হয়।

৪) যৌনতৃপ্তির চাহিদা

যৌবনপ্রাপ্তির সময় থেকেই যৌন সচেতনটা পরিণতি লাভ করে। শৈশবে যৌনবোধ নিতান্তই অসংগঠিত ও অপরিণত অবস্থায় থাকে। বাল্যকালে যৌনতা থাকে সুপ্ত বা অবদমিত অবস্থায়। কিন্তু যৌবনাগমে এই যৌনবোধ পরিণত ও সুসংগঠিত হয়ে ওঠে এবং ব্যক্তিতে সুস্থ ও স্বাভাবিক যৌনজীবন যাপনের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। এই পরিণত যৌন সচেতনতা প্রকাশ পায় ছেলেদের ক্ষেত্রে সঙ্গিনীর জন্য এবং মেয়েদের সঙ্গীর জন্য কামনার রূপে। এই সময় ছেলেরা ও মেয়েরা পরস্পরের সঙ্গ কামনা করে এবং পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা ও মেলামেশায় আনন্দ লাভ করে। সঙ্গী বা সঙ্গীনীর জন্য কামনা ছাড়াও যৌনচাহিদা আর একটি বিশেষ রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। সেটি হল যৌন কৌতুহল। এই সময় যৌনঘটিত বিষয় ও যৌনরহস্য সম্পর্কে জানবার জন্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে আদম্য আগ্রহ দেখা দেয়। তাদের এই চাহিদাটি তৃপ্তি করার জন্য সমাজে বিজ্ঞানভিত্তিক যৌন শিক্ষাদানের আয়োজন থাকা একান্ত প্রয়োজন। যেসব সমাজে যৌনশিক্ষাদনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই সেসব ক্ষেত্রে প্রাপ্তযৌবনেরা নানা উৎস থেকে যৌনবিষয় সম্পর্কে অর্ধসত্য ও বিকৃত তথ্য সংগ্রহ করে এবং তার ফলে তাদের যৌনজীবন অস্বাভাবিক ও অনেক সময় বিষময় হয়ে ওঠে।

টিপ্পনী

৫) নতুন জ্ঞানের চাহিদা

প্রাপ্তযৌবনদের ক্ষেত্রে মনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি পূর্ণতা লাভ করে এবং বিভিন্ন মানসিক শক্তিগুলি তাদের পরিণতিতে পৌছায়। ফলে তাদের স্বাভাবিক কৌতুহল অতি তীব্র হয়ে ওঠে এবং নতুন নতুন জ্ঞান লাভের প্রতি তাদের আকাঙ্খা দেখা দেয়। মানব অস্তিত্বের বহুমুখী ভাবধারার প্রতি তারা ক্রমশ আকৃষ্ট হয় এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন জ্ঞানভান্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করার প্রয়াস তাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। এই সময় প্রাপ্তযৌবনদের এই স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানলিপ্সাকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করার উপর তাদের সার্থক জীবন-প্রস্তুতি নির্ভর করে।

প্রাপ্তযৌবনদের প্রাক্ষভিক তৃপ্তি প্রধানত নিজেদের অভিব্যক্ত ও প্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। লেখাপড়া, খেলাধূলা, সঙ্গী, অভিনয়, সৃজনমূলক প্রচেষ্টা ইত্যাদির মদ্য দিয়ে তারা চেষ্টা করে নিজেদের বিকাশোন্মুখ সত্তাকে অভিব্যক্ত করতে এবং সমাজে আর সকলের কাছে নিজেদের মূল্য প্রতিষ্ঠিত করতে। এই চাহিদার তৃপ্তি প্রাপ্তযৌবনদের সুস্থ ও সুষম ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। যে সব ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই অত্যাবশ্যক চাহিদা অতৃপ্ত থেকে যায় তারা ভবিষ্যতে দুর্বলচেতা, আত্মবিশ্বাসহীন ও জীবনসংগ্রামে পশ্চাদ্‌পদ হয়ে ওঠে।

৬) নীতিবোধের চাহিদা

এই সময় ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভালমন্দ, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি বোধগুলিও সুপরিণত হয়ে ওঠে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন বস্তু বা কাজ সম্পর্কে নৈতিক মূল্যবোধ তাদের মধ্যে নিতান্তই অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট আকারের ছিল। যৌবনাগমে তাদের এ সম্পর্কে একটা সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসার প্রচেষ্টা দেখা যায়। নিজের বা পরের সকলের কাজই এই নীতিবোধের মাপকাঠিতে সে পরিমাপ করে এবং নিজে যদি কখনো তার এই নৈতিক মূল্যবোধের বিরোধী কাজ করে তাহলে সে তীব্র অপরাধবোধ থেকে কষ্ট পায়।

৭) আত্মনির্ভরতার চাহিদা বা বৃত্তির চাহিদা

এ সময়ে ছেলেমেয়েদের নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করতে দেখা যায় এবং কেমন করে স্বনির্ভর হওয়া যায় সে সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন তাদের মনে উদয় হয়। স্বাধীন উপার্জনক্ষম হয়ে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার নানা পরিকল্পনা তারা মনে মনে রচনা করে। বিভিন্ন বৃত্তি ও উপার্জনের পন্থার প্রতি তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হতে দেখা যায়। এইজন্য অনেকে এই চাহিদাটিকে বৃত্তির চাহিদা বলেও বর্ণনা করে থাকেন।

টিপ্পনী

৮) জীবনদর্শনের চাহিদা

যৌবনপ্রাপ্তিতেই প্রথম ছেলেমেয়েদের মনে জীবন ও বর্হিজগত সম্বন্ধে কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন জাগে। মানুষের জীবনের অর্থ কি, কিসেই বা জীবনের সার্থকতা বা এই সৃষ্টির রহস্য কি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি তাদের মনকে বারবার দোলা দিয়ে যায়। এইসব প্রশ্নগুলির উত্তর তারা সর্বত্র সন্ধান করে এবং সেগুলি সম্বন্ধে যতটুকু তথ্য তারা সংগ্রহ করতে পারে ততটুকু নিয়ে তারা মোটামুটি একটা ধারণা গড়ে তোলে। এ সময়ে দরকার হল তাদের মধ্যে এমন একটি সন্তোষজনক জীবনদর্শন গড়ে তোলা যা তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপ্রণালীকে সুনির্দিষ্ট ও অর্থময় করে তুলতে পারবে।

প্রাপ্তযৌবনদের চাহিদা তৃপ্তির প্রয়োজনীয়তা

প্রাপ্তযৌবনদের এই চাহিদাগুলির যদি যথাযথ তৃপ্তি না হয় তাহলে তাদের সঙ্গতিবিধান বিশেষভাবে ব্যাহত হয় এবং তা থেকে তাদের মধ্যে নানারকম অবাঞ্ছিত মানসিক জটিলতা ও আচরণমূলক বৈকল্য দেখা দেয়। ফলে তাদের ক্রমবিকাশের সুষ্ঠ অগ্রগতি নানাভাবে ক্ষুন্ন হয়ে পড়ে। যারা দুঃসাহসী তারা তাদের অতৃপ্ত চাহিদাগুলি মেটানোর জন্য অসামাজিক ও অমঙ্গলকর পন্থা গ্রহণ করে এবং সমাজে অপরাধপ্রবণ বলে কুখ্যাত হয়। যারা তা পারে না তারা তাদের চাহিদার আংশিক বা কৃত্রিম তৃপ্তিতেই সন্তুষ্ট থাকে কিংবা তাদের চাহিদা দমন করতে বাধ্য হয়। অধিকাংশ প্রাপ্তযৌবনই দিবা-স্বপ্ন বা অলীক কল্পনার মধ্য দিয়ে তাদের অতৃপ্ত চাহিদার তৃপ্তি খোঁজে। এর কোনটিই স্বাভাবিক বিকাশের অনুকূল নয় এবং স্বাস্থ্যময় ব্যক্তিসত্তার সৃষ্টিতে বিশেষ বাধাস্বরূপ। অতএব পিতামাতা শিক্ষক প্রভৃতি সকলেরই কর্তব্য হল যাতে প্রাপ্তযৌবনদের চাহিদাগুলি যথাসম্ভব তৃপ্তি লাভ করে এবং তাদের মধ্যে অবাঞ্ছিত জটিলতা দেখা না দেয় সেদিকে সযত্ন দৃষ্টি দেওয়া।

যৌবনপ্রাপ্তি-ঝড়ঝঞ্ঝা ও অপরাধ প্রবণতার কাল কি?

যৌবনপ্রাপ্তির সময় অপরিহার্যভাবেই যে অপরাধ প্রবণতা দেখা দেয় একথা সত্য নয়। বরং স্বাভাবিকভাবে এই সময় ছেলেমেয়েদের মধ্যে নৈতিক সচেতনতার পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে এবং এক উন্নত আদর্শবোধ কম-বেশী সব প্রাপ্তযৌবনের মনকেই প্রভাবিত করে থাকে। তবে যদি বিকৃত পরিবেশে বৈষম্যমূলক আচরণের দ্বারা প্রাপ্তযৌবনদের মন বিষাক্ত করে তোলা হয় তাহলে তাদের অনুভূতিশীল মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং অস্বাভাবিক আক্রমণধর্মিতা তাদের মধ্যে জাগতে পারে। এ সব প্রাপ্তযৌবনদের পক্ষে তখন অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠা মোটেই

অস্বাভাবিক নয়। অপরের কাছ থেকে তারা যে মনোযোগ ও সহানুভূতি স্বাভাবিক পন্থায় পায় না কোন অপরাধমূলক কর্মসম্পাদনের দ্বারা তারা সেই মনোযোগ ও স্বীকৃতি আদায় করার চেষ্টা করে। গুরুতর ক্ষেত্রে তারা পেশাদার দুষ্কৃতীকারীদের দলে যোগ দিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনে কুখ্যাত অপরাধী হয়েও উঠতে পারে। কিন্তু এই পরিণতি একান্ত অস্বাভাবিক পরিবেশেই ঘটতে পারে। সাধারণ স্বাভাবিক পরিবেশে প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে অপরাধী হবার কোন প্রবণতা দেখা যায় না– এটি পরীক্ষণ–প্রমাণিত সত্য।

টিপ্পনী

অনেক প্রাচীন মনোবিজ্ঞানী যৌবনপ্রাপ্তিকে 'ঝড়ঝঞ্ঝার কাল বা অপরাধপ্রবণতার কাল' বলে বর্ণনা করেছেন। বস্তুত বহু পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে এ মন্তব্যগুলি অতিশয়োক্তি। প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্তযৌবনদের মনে প্রাক্ষভিক বিপর্যয়, অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা এবং অনেক সময় উদ্যমতা দেখা দিলেও এগুলিকে সত্যকারের ঝড়ঝঞ্ঝা বলে বর্ণনা করা চলে না। তাছাড়া এ সময়ে যেটুকু বিপর্যয় ও অসঙ্গতি দেখা দেয় তা স্থায়ীও নয়। বস্তুত এই ধরনের সাময়িক অপসঙ্গতি তখনই সৃষ্টি হয় যখন তাদের গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাগুলি যথাযথ তৃপ্ত হয় না।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে একমত যে উপযুক্ত যত্ন ও মনোযোদ, সুবিবেচনা ও সহানুভূতি, মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রাপ্তযৌবনদের বিভিন্ন সমস্যাগুলি সমাধান করার চেষ্টা করলে তাদের মধ্যে এ ধরনের কোন আচরণমূলক সমস্যা দেখা দেয় না এবং সুস্থ ও সুষম ব্যক্তিসত্তার অধিকারী হয়ে তারা বড় হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে এ সময়ে তাদের মধ্যে যেসব বহুমুখী চাহিদা দেখা দেয় সেগুলির তৃপ্তির আয়োজন করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

তোমার প্রগতি ঠিক কর (Check your progress)

১) বয়ঃসন্ধিক্ষণের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত কর।
২) বয়ঃসন্ধিক্ষণ সম্বন্ধে মানুষের মনে যা কিছু ভুল ধারণা রয়েছে তার আলোচনা কর।
৩) বয়ঃসন্ধিক্ষণের কিছু চাহিদা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

Bhatia, B.D, R. Safaya, 1992 : Educational Psychology and Gaidance, Delhi Dhanpat Rai and Sons.

শিক্ষাদানে শিক্ষা মনোবিদ্যা ঃ Dr. Pratap Kumar Chattopadhyay, Rita Publication, Kolkata - 700009

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের রূপরেখা ঃ ড. প্রণব কুমার চক্রবর্তী, কে. চক্রবর্তী পাবলিকেশন্, কলকাতা – ৭০০০০৯

টিপ্পনী

একক - ২ বুদ্ধি (Intelligence)

■ বুদ্ধির সংজ্ঞা (Definition) ঃ

'বুদ্ধি' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা হয়; এর ফলে বুদ্ধির একটা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া প্রয়োজন। মজার কথা হল মনোবিজ্ঞানীরা বুদ্ধির কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দিতে পারেন না। বুদ্ধি ব্যক্তির সমগ্র সত্তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে আমরা এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির তুলনায় বেশি বা কম বুদ্ধিমান বলে মনে করি। যে ব্যক্তি অপেক্ষাকৃতভাবে বাস্তব পরিস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ বা সতর্ক থাকেন তাকে আমরা বুদ্ধিমান মনে করে থাকি এবং যে ব্যক্তি সেরূপ নয় তাকে বুদ্ধিহীন বলা হয়ে থাকে। আবার বুদ্ধি বলতে বোঝায় পর্যবেক্ষণ, ধারণা, চিন্তন, স্মরণ, কল্পনা প্রভৃতি মানসবৃত্তিগুলো, যা জ্ঞান লাভে সহায়তা করে। এই অর্থে জ্ঞান উৎপাদনকারী মানসশক্তিই বুদ্ধি। Woodworth মনে করেন যে বুদ্ধি কোনো বস্তু নয়, কিন্তু যে ভাবে বা যে প্রকারে কাজ করা হয় তাই বুদ্ধি। কোনো ব্যক্তি যে প্রকারে একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে কোনো কিছু করে থাকে সেই ক্রিয়াই হল বুদ্ধি বা নিবুদ্ধিতার পরিচায়ক।

টিপ্পনী

এবার দেখা যাক বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কীভাবে বুদ্ধিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন ঃ

ক) Terman মনে করেন যে বুদ্ধি হল বিমূর্ত চিন্তা করার শক্তি। তাঁর এই চিন্তাধারা একদেশদর্শী। বিমূর্ত চিন্তাই বুদ্ধির একমাত্র পরিচয় নয়। মনুষ্যেতর প্রাণীর বুদ্ধি আছে তা অস্বীকার করতে পারা যায় না, কিন্তু তাদের বিমূর্ত চিন্তা করার ক্ষমতা নেই।

খ) Thorndike-এর মতে বিভিন্ন বিষয়ের মতে অনুষঙ্গ অর্থাৎ সংযোগ স্থাপনের ক্ষমতাই বুদ্ধি। কিন্তু বুদ্ধির এই সংজ্ঞাও সন্তোষজনক নয়। শারীরবৃত্তের দ্বারা বুদ্ধির বর্ণনা একদেশদর্শী।

গ) অনেকে শিক্ষালাভের ক্ষমতাকে বুদ্ধি বলেছেন। Dearborn-এর মতে অভিজ্ঞতা থেকে লাভবান হওয়ার সামর্থ্যই বুদ্ধি। Woodrow বলেন বিশেষ বিশেষ সামর্থ্য অর্জন করাই বুদ্ধি। কিন্তু এসব সংজ্ঞাও বুদ্ধির সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারে না। বুদ্ধি না থাকলে শিক্ষালাভ করা যায় না, একথা ঠিক হলেও 'শিক্ষালাভের ক্ষমতা' নামে কোনো মৌলিক মানসিক ক্ষমতা আছে কিনা সে বিষয়ে অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীর সন্দেহ আছে।

ঘ) Spearman-এর দেওয়া বুদ্ধির সংজ্ঞাটিতে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয়কেই বড়ো করা হয়েছে। তাঁর মতে বুদ্ধি বলতে বোঝায় ত্রিবিধ মানসিক প্রক্রিয়া সম্পাদনের শক্তি। উদাহরণস্বরূপ - (i) অভিজ্ঞতার আহরণ; (ii) সম্বন্ধের নির্ণয় (Education of relation); (iii) সম-সম্বন্ধ বোধকের নির্ণয়ন (Education of correlates)। Spearman প্রদত্ত মনের এই ত্রিবিধ প্রক্রিয়ার নাম জ্ঞান বিকাশের সূত্রাবলি। তিনি মনে করেন আমাদের জটিল এবং অজটিল সব প্রকার জ্ঞানই এই ত্রিবিধ পন্থায় অর্জিত হয়ে থাকে।

ঙ) Thurstone বলেন যে বুদ্ধি হল এমন একটি ক্ষমতা যার সাহায্যে আমরা আমাদের বিভিন্ন প্রেরণাগুলোর উদ্ভব হওয়া মাত্রই তাদের স্বরূপ বুঝে তাদের তৃপ্ত হওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু এই

সংজ্ঞাও স্পষ্ট নয়। জৈবিক চাহিদাও একধরনের প্রেরণা। কিন্তু জৈবিক চাহিদা সম্পর্কে অবগত থাকলেই জীবকে বুদ্ধিমান বলা যায় না।

চ) আবার কোনো কোনো মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধির কার্যকরী বা ব্যবহারিক দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের মতে বাহ্য পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতাই বুদ্ধি। যেমন, Stern-এর মতে বাহ্য পরিবেশের নতুন নতুন দাবির পরিপ্রেক্ষিতে নিজের চিন্তাধারাকে সচেতনভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সাধারণ সামর্থ্যই বুদ্ধি নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। Edwards-ও মনে করেন যে বুদ্ধি হল প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তনম ও বৈচিত্র্য আনয়নের ক্ষমতা। Wechsler বুদ্ধির স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, বুদ্ধি হল ব্যক্তির একটা সামগ্রিক সামর্থ্য যার সাহায্যে ব্যক্তি একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য নির্দিষ্ট কাজ করতে, যুক্তিপূর্ণ চিন্তা করতে এবং পরিবেশের সাথে যথোপযুক্ত সংগতিসাধন করতে পারে। এখানে আমরা Wechsler-এর মতের সঙ্গে Binet-এর মতে সাদৃশ্য দেখতে পাই। Binet মনে করেন, "সুষ্ঠু অবধারণা, উপযুক্ত বোধ এবং উত্তম বিচারশক্তি বুদ্ধির আসল উৎস।" ("To judge well, to understand properly, to reason well, these are the essential springs of intelligence.") Binet-এর এই চিন্তাধারায় অবশ্য বুদ্ধির কার্যকরী বৈশিষ্ট্য উপেক্ষিত। Woodworth বোধ শক্তির (Intellect) ও বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য করেছেন। বোধশক্তি হল জ্ঞানলাভের সাধারণ শক্তি। বোধশক্তিকে যখন কাজে লাগানো হয় তখন তা বুদ্ধি বলে গণ্য হয়। কোনো ব্যক্তি অনেক জ্ঞানের অধিকারী হয়েও যদি তার জ্ঞানভান্ডারকে কাজে লাগাতে না পারে তাহলে তাকে বুদ্ধিমান বলা হবে না। মনোবিজ্ঞানী Munn-ও বলেছেন যে বাহ্য পরিবেশের সঙ্গে সমন্বয়নের নমনীয়তা ও বহুমুখিনতাই বুদ্ধি বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

টিপ্পনী

ওপরের প্রদত্ত বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীর দেওয়া সংজ্ঞা থেকে আমরা কতকগুলো অনুসিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। কোনো কোনো মনোবিজ্ঞানী বিমূর্ত (Abstract) চিন্তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বুদ্ধিকে যখন বিমূর্ত চিন্তন ক্ষমতা রূপে বলা হয় তখন এই জাতীয় সংজ্ঞাতে পরিস্থিতির মোকাবিলায় ধারণা ও প্রতীকের কার্যকর ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। কোনো সমস্যাকে বাচনিক ও সংখ্যাগত প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করে সমাধান করার জন্য বিমূর্ত চিন্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

Terman-এর মতে কোনো ব্যক্তির বুদ্ধি তার বিমূর্ত চিন্তন ক্ষমতার সমানুপাতিক। ওপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, বুদ্ধি হল একধরনের মানসিক ক্ষমতা। একে কেউ শিখন ক্ষমতা, কেউ অভিযোজন ক্ষমতা, কেউ বিমূর্ত চিন্তন ক্ষমতা বলেছেন। প্রত্যেকটিরই অবশ্য ওপর জোর দিয়েছেন। কতকগুলো সংজ্ঞা খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতার ওপরও গুরুত্ব দিয়েছেন। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মনোবিদ্যাকে 'আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান' (Science of behaviour) বলে অভিহিত করার পক্ষে। তা যদি হয় বুদ্ধির শেষোক্ত শ্রেণির সংজ্ঞাগুলোই বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীর মতে বুদ্ধির মধ্যে এই তিন রকম সামর্থ্য তো আছেই তাছাড়া আরও কিছু সামর্থ্য আছে।

একটি বাক্যে বুদ্ধির সম্পূর্ণ সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। Woodworth কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে নিম্নলিখিতভাবে বুদ্ধির স্বরূপকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন ঃ ১) অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো বুদ্ধির একটা চিহ্ন। ২) নতুন এবং জটিল পরিস্থিতিকে আয়ত্ব করা বুদ্ধির আর

একটা চিহ্ন। ৩) সমস্যার মূল কোথায় তা বার করার অন্তর্দৃষ্টিও বুদ্ধির একটা লক্ষণ। ৪) দূরদৃষ্টি বা একটা সমস্যাকে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করার ক্ষমতাও বুদ্ধির লক্ষণ।
বুদ্ধি সম্বন্ধে কিছু তত্ত্ব (Some theories of Intelligence) ঃ

■ Spearman-এর দ্বি-উপাদান তত্ত্ব (Spearman's two-factor theory) ঃ

টিপ্পনী

• Spearman বহু শিক্ষার্থী এবং ছেলেমেয়েদের বৌদ্ধিক কর্ম সম্পাদন (cognitive performance)-এর প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেন। 'বৌদ্ধিক' কাজ বলতে আমরা সেইসব কাজকে বোঝাই যা করতে গিয়ে প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার কোনো স্থান নেই। এই সব কাজের মধ্যে নিছক বুদ্ধির প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই। এই ধরনের কাজ করতে গিয়ে শিক্ষার্থী এবং ছেলেমেয়েরা যা কিছু তুলে ধরেছে তা বিশ্লেষণ করে Spearman এই সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত করেন তা মানুষের বুদ্ধির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। তাঁর মতে যে-কোনো রকমের বৌদ্ধিক কাজ করতে গেলে দু-রকমের মানসিক উপাদান (factor) প্রয়োজন হয়। মজার ব্যাপার হল, এই দু-ধরনের উপাদানের মধ্যে একটা উপাদান সব রকম বৌদ্ধিক কাজের জন্য প্রয়োজন হয়; অপর উপাদানটি বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ রূপে প্রকাশ পায়।

• Burt এবং Vernon-এর উচ্চ-ক্রমপর্যায় ভিত্তিক তত্ত্ব (Hierarchy theory of Burt and Vernon) ঃ

১৯৪০ সালে Burt বৌদ্ধিক ক্ষমতাকে রাশিবিজ্ঞানের সাহায্যে চারটি উপাদানে ভাগ করেছেন। সেগুলি হল - ১) সাধারণ উপাদান যা সমস্ত প্রলক্ষণ (Trait)-এর ক্ষেত্রে প্রয়োজন। ২) দলগত শক্তি যা কয়েকটি প্রলক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজন। ৩) বিশেষ উপাদান যা নির্দিষ্ট একটা প্রলক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজন। ৪) ভ্রান্তি উৎপাদন যা প্রতিটি প্রলক্ষণের পরিমাপের সময় দেখা যায়।

Burt উচ্চক্রম পর্যায়ভুক্ত পাঁচটি স্তরের একটি নমুনা (Model)-র প্রস্তাব দেন। যেমন, (i) মানব মন (Human mind) (ii) সাধারণ উপাদান বা সম্পর্কের স্তর (General factor or relational level) (iii) অনুষঙ্গ (Associations), (iv) প্রত্যক্ষণ (Perception) এবং (v) সংবেদন (Sensation)।

১৯৫০ সালে Vernon উপাদান বিশ্লেষণ (Factor analysis)-এর মাধ্যমে বৌদ্ধিক সংগঠনের ব্যাখ্যা দেন। তিনি বুদ্ধির ওপর বিশদ গবেষণা করেন এবং গবেষণার ভিত্তিতে উচ্চ-ক্রমপর্যায়ভুক্ত দলগত উপাদানের কথা বলেন। তিনি বলেন বুদ্ধি অভীক্ষা (Intelligence Test)-য় একটি সাধারণ উপাদান 'G' এবং 'n' দলগত মানসিক ক্ষমতা পাওয়া যায়। প্রধান দলগত মানসিক ক্ষমতাগুলো হল - ১) বাচনিক (Verbal), সংখ্যাপদ (Numerical) এবং শিক্ষাগত (Educational)।

২) ব্যবহারিক (Practical), যান্ত্রিক (Machanical), অবস্থানগত (Spatial) এবং শারীরিক (Physical)।

এই দুটি প্রধান দলগতশক্তি আবার গৌণ দলগত শক্তিতে ভাগ হতে পারে - যেমন, যান্ত্রিক

(Mechanical) ও কায়িক (Manual)। চূড়ান্ত পর্যায় ওই গৌণ উপাদানগুলো আবার ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ উপাদানে বিভক্ত করা যায়।

• বুদ্ধি তত্ত্ব প্রসঙ্গে Guilford-এর মতবাদ (Theories of intelligence theory of Guilford) ঃ

টিপ্পনী

বুদ্ধির ওপর যতগুলো মতবাদ দেখা গেছে সেগুলো জটিল, অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ। এই রকম সন্ধিক্ষণে মনোবিজ্ঞানী Guilford তাঁর যুগান্তকারী ত্রি-মাত্রিক (Tri-dimensional theory) তত্ব বুদ্ধির ওপর প্রকাশ করেন। একাধিক অভীক্ষায় (Test) প্রাপ্তফলের উপাদান বিশ্লেষণের মাধ্যমে Guilford ও তাঁর সহযোগীগণ এই তত্ত্বটি প্রকাশ করেন।

Guilford বুদ্ধির যে তিনটি মাত্রার কথা বলেছেন তা হল বিষয়বস্তু (content), মানসিক প্রক্রিয়া (Operation) এবং উপজাত ধারণা বা উপাদানগত ধারণা (Product)।

❖ **১) বিষয়বস্তু ঃ** বিষয়বস্তু বলতে উদ্দীপককে বোঝানো হয় এবং সেই উদ্দীপকের মাধ্যমেই বৌদ্ধিক ক্রিয়া সচল রাখে। এই বিষয়বস্তু নিম্নরূপ -

ক) মূর্ত বস্তু (figural) ঃ মূর্তবস্তু অবয়বযুক্ত ও বাস্তবে বিদ্যমান, যেমন কোনো মানুষ, কোনো প্রাণী ইত্যাদি।

খ) সাংকেতিক (symbolic) ঃ যে চিহ্ন কোনো মূর্ত বস্তুর প্রতীক; যেমন একটা সংখ্যার চিহ্ন, +, - ইত্যাদি।

গ) ভাষামূলক (semantic) ঃ শব্দ, শব্দার্থ, ভাষা ইত্যাদি।

ঘ) আচরণমূলক (behavioural) ঃ অন্য ব্যক্তির বা প্রাণীর আচরণ।

❖ **২) মানসিক প্রক্রিয়া ঃ** মানসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৌদ্ধিক মানসিক ক্রিয়া বাহিত হয়।

• Guilford-এর ধী-ক্ষমতার কাঠামোগত নমুনা (Guilford's model of structure of intellect) ঃ

বৌদ্ধিক উপাদানগুলোকে শনাক্ত করার পর Guilford কাঠামোগত নমুনার নকশা তৈরী করেছেন। এই উপাদানগুলো উর্ধ্বক্রম অনুযায়ী বিন্যস্ত নয় (Non-hierarchical)। তাঁর মতে ধী-ক্ষমতার তিনটি মাত্রা রয়েছে ঃ প্রক্রিয়াগত (Operational), বিষয়বস্তুগত (Content-based) এবং উপাদানগত (Product-based)। পরের পাতার চিত্রের মাধ্যমে তা দেখানো যেতে পারে ঃ

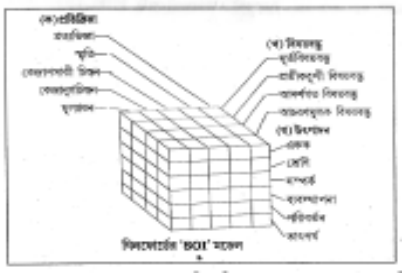

Guilford-এর মতে আমাদের মন ত্রি-মাত্রিক (Tri-dimensional), একমাত্রিক (Single dimensional) নয়; আগে কিন্তু এই রকমেই মনে করা হত। বুদ্ধিকে তাই তিনটি মাত্রায় বিবেচিত করতে হবে। সেই তিনটি মাত্রা আগেই আমরা উল্লেখ করলাম। এবার আসা যাক প্রক্রিয়ার মাত্রায়। বলাই বাহুল্য (i) মানসিক প্রক্রিয়া মাত্রায় পাঁচটি শ্রেণি রয়েছে। এগুলো হল-

ক) প্রজ্ঞা (Cognition) ঃ এটা হল শিখন প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা জ্ঞানের বিষয় আমরা আয়ত্ব করার চেষ্টা করি।

খ) স্মৃতি (Memory) ঃ এটা একটা প্রাথমিক মানসিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জ্ঞানের বিষয়কে সংরক্ষণ এবং প্রত্যভিক্ষা করা যায়।

গ) বিচ্ছিন্ন চিন্তন (Divergent thinking) ঃ এই ধরনের চিন্তনে আমরা নানাভাবে চিন্তা করি। এই অর্থে চিন্তনকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়। একটার সঙ্গে আর একটার যেন কোনো যোগ নেই। কিন্তু এর ফলে চিন্তার প্রসার এবং নতুন অন্বেষণের প্রসার ঘটে। সৃজনশীলতা (Creativity)-র ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটি খুবই কার্যকরী।

ঘ) সংকুচিত চিন্তন (Convergent thinking) ঃ এটা হল প্রদত্ত তথ্য থেকে সবচেয়ে ফলপ্রসূ তথ্যে উপনীত হওয়া। প্রদত্ত তথ্য প্রতিক্রিয়াকে নির্দিষ্ট করে। নতুন কিছু অন্বেষণ করার সুযোগ এবং প্রয়াস এক্ষেত্রে লক্ষ করতে পারা যায়।

ঙ) মূল্যায়ন (Evaluation) ঃ আমরা যা জানি বা যা ভাবি বা যা স্মরণ করি বা যা সৃষ্টি করি - এ সব কিছুরই নির্ভুলতা, নৈর্ব্যক্তিকতা, উপযুক্ততা, যথার্থতা বিচার করাই হল মূল্যায়ন।

(ii) বিষয়বস্তুগত মাত্রা (Content-based dimension) ঃ বৌদ্ধিক বা জ্ঞানমূলক তথ্যকে বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে Guilford চারভাগে ভাগ করেছেন। যথা -

ক) চিত্রগত বা মূর্ত বিষয়বস্তু (Figural content) ঃ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুধাবন করা যায় এমন মূর্ত বস্তু, যেমন, দৃশ্যগ্রাহ্য বস্তুর আকার, আকৃতি, রং ইত্যাদি। সহজভাবে বলতে গেলে যা আমরা দর্শন, শ্রবণ করি তা এর অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে বস্তু ছাড়া অন্য কিছুকে বোঝানো হচ্ছে না।

খ) প্রতীকি বিষয়বস্তু (Symbolic content) ঃ এটা হল অক্ষর, সংখ্যা এবং অন্যান্য প্রথাগত সংকেত যা বিন্যস্ত থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, বর্ণমালা (Alphabet), সংখ্যাশ্রেণি (Number series), আঙ্গিক চিহ্ন (Arithmatical sign) যেমন +, -, ×, ÷) ইত্যাদি।

গ) বিমূর্ত ভাষামূলক বিষয়বস্তু (Abstract content) ঃ এটা হল ভাষাগত বা ভাবগত অর্থ যেমন নিম্নোক্ত প্রবাদটি, (ভাগের মা গঙ্গা পায় না, অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা)।

ঘ) আচরণমূলক বিষয়বস্তু (Behavioural content) ঃ এটা হল সামাজিক আচরণ, যার মাধ্যমে নিজেদের ও অন্যান্যদের বোঝবার এবং মেলামেশার ক্ষমতাকে বোঝায়।

(iii) উৎপাদন বা ফলশ্রুতি (Product) ঃ Guilford মনে করেন যখন কোনো বিষয় বস্তুর ওপর প্রক্রিয়া কার্যকরী হয় তখন ছয় রকমের ফলশ্রুতি দেখা যায়। এই ধরনের ফলশ্রুতি হল-

ক) একক (Unit) ঃ বিষয়কে কেন্দ্র করে দৃষ্টি, শ্রুতি এবং প্রতীকসহ জ্ঞান অর্জন করার ক্ষমতা

টিপ্পনী

এর অন্তর্ভুক্ত।

খ) শ্রেণি (Class) ঃ সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জ্ঞাত বস্তুর বা পদগুলির শ্রেণিকরণ।

গ) সম্পর্ক (Relations) ঃ দুই বা ততোধিক তথ্য বা বস্তুর মধ্যে যে সংযোগ তা চিনতে পারা; তাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা।

ঘ) প্রণালী (System) ঃ বিভিন্ন অংশের মধ্যে জটিল আন্তঃসম্পর্ক সংগঠিত করা বা কাঠামো তৈরি করা। উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারা যায় যে মাধ্যাকর্ষণ না থাকলে কী হত?

টিপ্পনী

ঙ) রূপান্তরণ (Transformations) ঃ জ্ঞাত তথ্যাবলির বিভিন্ন রকম অর্থ, অবদান ও ব্যবহারে রূপান্তর করা; যে তথ্য ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে তার অবস্থার পরিবর্তন।

চ) তাৎপর্য বিচার (Implications) ঃ কোনো প্রত্যাশার পূর্ব অনুমান ভবিষ্যৎবাণী করতে পারা বা সম্ভাব্যতা উল্লেখ করা। ভবিষ্যতের কথা বর্তমানে প্রেক্ষিতে চিন্তা করার ক্ষমতা এই ফলশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত।

ওপরের বুদ্ধির যে তিনটি মাত্রা - প্রক্রিয়ার মাত্রা, বিষয়বস্তুর মাত্রা এবং উৎপাদন বা ফলশ্রুতির মাত্রা আলোচনা করা হল তা ১৫০ পৃষ্ঠার ছকের মাধ্যমে ব্যক্ত করতে পারা যায়।

ঘনক্ষেত্র (cube)-এর একদিকে আছে প্রতিক্রিয়ার মাত্রা, একদিকে আছে বিষয়বস্তুর মাত্রা এবং তৃতীয় দিকে আছে ফলশ্রুতি বা উৎপাদনগত মাত্রা। প্রক্রিয়াগত মাত্রার পাঁচটি শ্রেণি, বিষয়গত মাত্রার চারটি এবং উৎপাদন গত মাত্রার ছটি অর্থাৎ মোট ৫x৪x৬=১২০টি বুদ্ধির উপাদান আছে। বর্তমান বিষয়বস্তুগত মাত্রার চিত্রগত বিষয়কে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে - দৃষ্টিগত ও শ্রবণগত। ফলে বিষয়বস্তুর মাত্রা চারটির পরিবর্তে পাঁচটি শ্রেণি হয়েছে এবং বুদ্ধির মোট উপাদান হয়েছে (৫x৫x৬=১৫০টি)। Guilford উপাদান বিশ্লেষণের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত নব্বইটি বুদ্ধির উপাদান আবিষ্কার করেছেন। Guilford-এর দৃঢ় ধারণা অবশিষ্ট ধারণাগুলি আবিষ্কৃত হবে।

SOI-র শিক্ষাগত তাৎপর্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই মতবাদটি শুধুমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রে নয় বৃত্তিগত অভীক্ষায় কার্যকরী হয়েছে।

এবার দেখা যাক মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে 'SOI' নমুনা কী রকম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। পাঁচ ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া বোঝা যায় যে কাজ করার পাঁচটি উপায় আছে। ছয় শ্রেণির উৎপাদন বা ফলশ্রুতি ছয় ধরনের বৌদ্ধিক ক্ষমতার অর্থবহন করে। এর প্রেক্ষিতে প্রশ্নের শ্রেণিকরণ করা যেতে পারে। Guilford যেভাবে SOI নমুনার সাহায্যে বৌদ্ধিক উপাদানগুলো ভাগ করেছেন ভবিষ্যতে তার প্রভাব বিভিন্ন গবেষণায়, বিশেষ করে শিক্ষণ, স্মৃতি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক ক্রিয়ামূলক কাজ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

Guilford মনে করেন বাচনিক ধারণার মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে উপলব্ধি করার জন্য বিমূর্ত ভাষামূলক (Semantic) বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। সামাজিক বুদ্ধি সমাজের নিজের ও অন্যদের আচরণ বোঝবার জন্য বিশে, দরকার। কিছু ব্যক্তি যেমন শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, সামাজিক কর্মী, সাংবাদিক, কোম্পানির দালাল এবং নেতা রয়েছেন যাদের সঙ্গে অন্যান্য ব্যক্তিদের সম্পর্ক রেখে চলতে হয় সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে এই বুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন হয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে 'SOI' নমুনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেখা যাক কীভাবে এই নমুনা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী শিখন হল উদ্দীপক (Stimulus) এবং প্রতিক্রিয়া (Response)-র মধ্যে বন্ধন (Bond)। কিন্তু Guilford-এর 'SOI' নমুনা অনুযায়ী শিখন ও উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কেবল মাত্র বন্ধন নয়, তথ্য আবিষ্কারও বটে। মানুষ তথ্য বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে এবং বিন্যাস করতে সক্ষম হয়। মানুষের চিন্তা 'computer'-এর চেয়েও এগিয়ে রয়েছে। মানুষের চিন্তন শুধুমাত্র তথ্য সঞ্চয় করে না, তথ্য সরবরাহ ও মূল্যায়নও করে থাকে।

টিপ্পনী

অতীতে শিক্ষা ছিল বুদ্ধির অনুশীলন কিন্তু Guilford-এর SOI নমুনা অনুযায়ী শিক্ষা হল নির্দিষ্ট অভ্যাস ও দক্ষতার শিখন। শিক্ষার উদ্দেশ্য বলতে যদি আমরা বৌদ্ধিক বিকাশকে বুঝি তাহলে বিষয়বস্তু, প্রক্রিয়া এবং উৎপাদনের নির্দিষ্ট সমন্বয়ের ভিত্তিতে পাঠক্রমকে সংগঠিত করতে হবে।

Stern-এর একক উপাদান তত্ত্ব (Unifactor theory of Stern) ঃ

অধ্যাপক Stern বুদ্ধিকে একক শক্তি হিসেবে কল্পনা করেছেন এবং এই শক্তি সব ধরনের মানসিক কাজে লাগে। এই মতবাদকে যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে অনেক অসুবিধে দেখা যায়। যেমন কোনো একজন ব্যক্তি যদি একটি কাজে সফল হয় তাহলে সে এই মতবাদ অনুযায়ী সব কাজে সফল হবে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। একই ভাবে যদি কোনো ব্যক্তি একটি কাজে বিফল হয় তাহলে সে সব কাজে বিফল হবে। কিন্তু বাস্তবে এ দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। সাহিত্য একজন দক্ষ ব্যক্তি গাণিতিক কাজে দক্ষ নাও হতে পারে আবার একজন গণিতজ্ঞ সাংসারিক হিসাব রক্ষায় ব্যর্থ - এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

Thorndike-এর বহু উপাদান তত্ত্ব (Multiple factor theory of Thorndike) ঃ

Thorndike বহু উপাদান তত্ত্বের উপস্থাপনা করেন। তাঁর মতে নির্দিষ্ট উদ্দীপকের সঙ্গে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার যে মেলবন্ধন তারই নাম বুদ্ধি। স্নায়ুতন্ত্রের বন্ধনের সংখ্যা কম বেশি হওয়াতে ব্যক্তিভেদে বুদ্ধির তারতম্য ঘটে। Thorndike-এর মতে সাধারণ বুদ্ধি বলে কিছু নেই। তাঁর মতবাদকে বুদ্ধির পারমাণবিক তত্ত্ব (Atomistic theory of intelligence)-ও বলা হয়। Thorndike-এর মতে নিম্নোক্ত চারটি গুণ বুদ্ধির সম্পর্কে প্রযোজ্যঃ

(i) স্তর (Level) ঃ স্তর হল কাজের জটিলতার মাত্রা। ব্যক্তি যে পরিমাণ কঠিন কাজ করতে সক্ষম হয় তাই হল তার বুদ্ধি। একক হিসেবে এর পরিমাপ করা যায় না।

(ii) বিস্তৃত (Range) ঃ যত কঠিন সমস্যার সমাধান করতে পারা যায় ততই বুদ্ধির ব্যাপ্তি বা বিস্তৃতি ধর্ম বোঝা যায়। তত্ত্বগতভাবে একজন ব্যক্তি বুদ্ধির যে স্তরে অবস্থান করছে সেই স্তরের সমস্ত সমস্যাই তার সমাধান করা উচিত। বুদ্ধির বিস্তৃতির জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞতার ব্যাপকতা এবং শিখন।

(iii) ক্ষেত্র (Area) ঃ নির্দিষ্ট স্তরে বিভিন্ন পরিস্থিতির সমস্যার সমন্বয়কে ক্ষেত্র বলে। বুদ্ধির

প্রতিটি স্তরে ব্যক্তির যত সংখ্যক পরিস্থিতির প্রতি সফল প্রতিক্রিয়া করতে সক্ষম হয় তাকে তার বুদ্ধির ক্ষেত্র বলে।

(iv) গতি (Speed) ঃ সমস্যা সমাধানের দ্রুততাই বুদ্ধির গতিধর্ম। প্রতিটি বুদ্ধি অভীক্ষায় উক্ত চারটি ধর্ম আছে। কোনো ব্যক্তির বুদ্ধির পরিমাপ করতে গেলে তাকে বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে দেওয়া হয় (ক্ষেত্র)। এই কাজগুলির কঠিনতার মান ভিন্ন (স্তর)। প্রতিটি স্তরে কিছু সমস্যা বা প্রশ্ন থাকে (বিস্তার) এবং নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান করতে হয় (গতি)।

টিপ্পনী

- **Thompson-এর বাছাই তত্ত্ব (Sampling Theory of Thompson) ঃ**

মনোবিজ্ঞানী Thompson মনে করেন যে বুদ্ধি কোনো একটি শক্তি নয় বা কিছু শক্তির সমন্বয়ও নয়। মনের মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি আছে যেগুলি পরস্পর মৌলিক। প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি হল বুদ্ধির একক। Thompson-এর মতে আমাদের মন কতকগুলো মৌলিক পরস্পর-নিরপেক্ষ উপাদানের সমবায়ে গঠিত। এরা এতই সূক্ষ্ম যে তাদের বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। আবার এদের প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। কোনো কাজে কী পরিমাণ মানসিক উপাদানের প্রয়োজন হবে তা নির্ভর করে বাছাই (Sampling)-এর নীতির ওপর। এখন বিভিন্ন কাজের মধ্যে একই রকম মৌলিক উপাদানের পরিমাণ যত বেশি হবে তত তাদের মধ্যে সহগতিও বেশি হবে। Thompson-এর মতে বৌদ্ধির কাজের মধ্যে যে সহগতি তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা যায় এই উপাদান সমূহের মাধ্যমে। গাণিতিক দিক থেকে Thompson-এর বাছাই তত্ত্ব নির্ভুল। এই কারণে Bert, Vernon প্রমুখ মনোবিজ্ঞানী এই মতবাদকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী Spearman ১৯০৪ সালে প্রথম তাঁর বুদ্ধির দ্বি-উপাদান তত্ত্বটি প্রকাশ করেন। তিনি একটি সাধারণ মানসিক সামর্থ্য (General mental ability or 'G')-এর উল্লেখ করেন এবং 'G'-এর জন্য আমরা কোনো কিছু সম্বন্ধে সজ্ঞান থাকি, বস্তুটির গুণাগুণ বিচার করি এবং নিজেদের সজ্ঞানতা সম্বন্ধে সচেতন হই, বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ ধরতে পারি এবং অর্জিত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাকে নানা বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করে নতুন অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান লাভ করি। সংক্ষেপে 'G' আমাদের সকল প্রকার কার্যকলাপের মধ্যে রয়েছে। Spearman কয়েকটি বিশেষ সামর্থ্যের কথাও একই সঙ্গে বলেন। এই বিশেষ সামর্থ্যগুলি (specific abilities)-কে 'S' বলেছেন। Spearman-এর মতে প্রত্যেক বুদ্ধি প্রসূত কাজেই এই সাধারণ সামর্থ্য এবং বিভিন্ন বিশেষ সামর্থ্য কাজ করে। সামান্য বা সাধারণ সামর্থ্য ও বিশেষ সামর্থ্যের যোগফলই বুদ্ধি। উদাহরণ স্বরূপ একই ব্যক্তি ইংরেজি, বাংলা, দর্শন, গণিত প্রভৃতি যেকোনো বিষয় বুঝতে গিয়ে 'G' উপাদানটি ব্যবহার করে থাকে। 'G' হল ব্যক্তির সাধারণ বুদ্ধি অথবা যাকে বলা যেতে পারা যায় সাধারণ জ্ঞান (common sense) কিন্তু এই ব্যক্তিরই হয়তো অঙ্কে বিশেষ মাথা আছে। কাজেই সে অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় অঙ্কে সাফল্য লাভ করে বেশি। আবার অন্যান্য বিষয়ে মোটের ওপর সাফল্য লাভ করে সাহিত্যেই হয়তো তার সাফল্য অসাধারণ।

ব্যক্তির বুদ্ধিমূলক কাজের সাধারণ ভিত্তি হল 'G' বা সাধারণ সামর্থ্য; বা অপরপক্ষে কোনো বিশেষ বুদ্ধিমূলক ক্রিয়ার ভিত্তি হল 'S' বা বিশেষ সামর্থ্য। মনে রাখতে হবে যে 'G' একটা, কিন্তু 'S' বুদ্ধিমূলক ক্রিয়ার বিভিন্নতা অনুসারে বিভিন্ন। এর ফলেই সফল বুদ্ধিমূলক

ক্রিয়ার একটা 'G' ক্রিয়াশীল হয়, কিন্তু প্রত্যেকটা বিশেষ বুদ্ধিমূলক ক্রিয়ার এক-একটা পৃথক 'S' কাজ করে; অথবা কোনো দুটি ক্রিয়ায় একই 'S' কাজ করে না। এ থেকে আমরা বুঝতে পারছি 'G' শক্তিটা সর্বগামী অর্থাৎ সমস্ত কাজেই তার প্রয়োজন হবে। আবার এটাও ঠিক যে 'G'-এর পরিমাণ সব কাজে সমান হবে না। আর 'S' হল কোনো বিশেষ কাজের উপযোগী একটা বিশেষধর্মী শক্তি এবং সেই বিশেষ কাজটি ছাড়া অন্য কোনো কাজে সেই 'S' এর প্রয়োগ হবে না। অতএব প্রত্যেক কাজের জন্য একটি স্বতন্ত্র 'S' আছে।

যে পদ্ধতি অনুসরণ করে Spearman বুদ্ধির দ্বি-উপাদান মতবাদ আবিষ্কার করেন তা হল ঃ বুদ্ধির অভীক্ষা (Intelligence Test) বা পরীক্ষার ভিত্তিতে তিনি দেখলেন যে বিভিন্ন কৃতি (Performance)-র সাফলাঙ্ক (score)-এর সঙ্গে পারম্পর্য (correlation) আছে। কোনো ব্যক্তি একটি বিশেষ বুদ্ধি ক্রিয়ায় যেমন সাফল্য লাভ করে, আরও কতকগুলো বিশেষ বুদ্ধি ক্রিয়ায় হয়তো তেমনই সাফল্য লাভ করে। যার গণিতে পারদর্শিতা আছে, তার হয়তো আবার পদার্থবিদ্যায়ও সমান পারদর্শিতা থাকতে পারে। অথচ গণিত এবং পদার্থবিদ্যা দুটি বিশেষ সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল দুটি পৃথক বিষয়। তাহলে বলতে হয় যে এই দুটি বিষয়ে বুদ্ধি গ্রাহ্যতা যেমন দুটি পৃথক বুদ্ধি সামর্থ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তেমনি তাদের উভয়ের কোনো সাধারণ বা সামান্য বুদ্ধি সামর্থ্যের ওপরও প্রতিষ্ঠিত।

টিপ্পনী

অথএব Spearman-এর মতানুসারে কোনো ব্যক্তির বুদ্ধির পরিমাপ করতে হলে G+S এই সমীকরণের সাহায্যে করতে হয়। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির বুদ্ধি হল সাধারণ এবং বিশেষ বুদ্ধি সামর্থ্যের যোগফল। আমরা আর একটা অনুসিদ্ধান্তে যেতে পারি যে বিভিন্ন কাজের জন্য একটা বিশেষ 'S' এবং কিছু পরিমাণ 'G'-এর প্রয়োজন আছে। বিভিন্ন কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী 'G'-এর পরিমাণও কম বা বেশি হচ্ছে। Spearman-এর মতবাদ অনুযায়ী আমাদের সমস্ত মানসিক ক্রিয়ার মূলে দুটো উপাদান বর্তমান। সেইজন্য এই মতবাদটিকে দ্বি-উপাদান তত্ত্ব বলা হয়। একে এককেন্দ্রিক (Unifocal) মতবাদও বলা যেতে পারা যায়। কারণ তাঁর মতে সব বিশেষ সামর্থ্যে অন্তর্নিহিত একটা সাধারণ সামর্থ্য বিদ্যমান।

মনোবিদ্যার দিক থেকে 'G' হল বুদ্ধি বা মানসশক্তি। শারীরবৃত্তির দিক থেকে বলা যায় এটা এমন একটা শক্তি বা স্নায়ুতন্ত্রের নমনীয়তা, রক্ত চলাচলের অবস্থা, গ্রন্থির সামঞ্জস্য প্রভৃতি ক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল। এমনকি 'G' নামক শক্তিটি একটা মানসক্রিয়া থেকে আর একটা মানসক্রিয়ার সংক্রামিত হতে পারে।

Spearman শুধুমাত্র গাণিতিক বিশ্লেষণ করেই তাঁর কাজ শেষ করেননি; তিনি এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে তাৎপর্য উদঘাটন করেছেন তা মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। Spearman উল্লেখিত G-উপাদানকে গাণিতিক উপাদান-বিশ্লেষণ (Factor analysis) এর পদ্ধতি দ্বারা গাণিতিক মাত্রা (Mathematical value) হিসেবে পেয়েছেন। এর প্রকৃত স্বরূপ কী Spearman নিজেও তা বলতে পারেননি। মানুষের বিচার বিবেচনামূলক কাজের বিশ্লেষণ করেই একে খুঁজে পাওয়া যায়। মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে এই G-উপাদানকে আমরা বুদ্ধির সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করতে পারি। Spearman এর মতে এটা এমন একটা শক্তি যা এক কাজ থেকে অন্য কাজে স্থানান্তরিত হয়। এই সাধারণ উপাদান Spearman-এর মতে মনের ও একটি সার্বজনীন ক্ষমতা। বলাই বাহুল্য, এই সার্বজনীন ক্ষমতা বুদ্ধি ছাড়া অন্য কিছু

হতে পারে না। এদিক থেকে দেখতে গেলে Spearman-এর দ্বি-উপাদান তত্ত্ব বুদ্ধিরও তত্ত্ব। লক্ষ করার বিষয় হল যে কর্মসম্পাদনের দক্ষতাকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি দেখালেন যে দু-শ্রেণির মানসিক উপাদানের খোঁজ তিনি পেয়েছেন। কিন্তু বুদ্ধি দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত - একথা তিনি বলেননি।

- Thurstone-এর মৌলিক মানসিক শক্তি সম্বন্ধীয় তত্ত্ব (Thurstone's primary ability theory) ঃ

টিপ্পনী

Thurstone বুদ্ধির এককেন্দ্রিকবাদ স্বীকার করেন না। তাঁর মতে বুদ্ধি বলে একক কোনো সামর্থ্য নেই; বুদ্ধি বলতে বোঝায় সাতটি মৌলিক শক্তি। উদাহরণস্বরূপ -

১) 'V' (Verbal comprehension) বা কথা বোঝার শক্তি।

২) 'N' (Number facility) বা সংখ্যা ব্যবহারের সহজ শক্তি।

৩) 'M' (Memory) বা স্মৃতিশক্তি।

৪) 'R' (Inductive reasoning) বা আরোহমূলক বিচারশক্তি।

৫) 'P' (Perceptual ability) বা প্রত্যক্ষ করবার শক্তি।

৬) 'S' (Space comprehension) বা বস্তুর দৈহিক জ্ঞান।

৭) 'W' (Word fluency) বা কথা বলার এবং লেখার শক্তি।

৮) প্রত্যক্ষণগত উপাদান (Perceptual factor-P) : বস্তু বা লক্ষ্যকে সঠিকভাবে প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা।

৯) সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা উপাদান (Problem-solving ability factor-PS) ঃ স্বাধীন প্রচেষ্টায় কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারার ক্ষমতা।

বিভিন্ন বৌদ্ধিক কাজ করার জন্য এই সব প্রাথমিক উপাদানের কয়েকটি মিলে দলগত ভাবে কাজ করে -

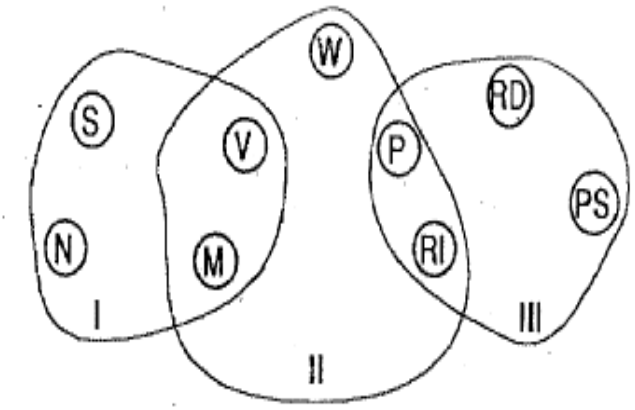

যেমন এক নম্বর কাজ করতে (S), (V), (N), (M)-এই চারটি উপাদান লেগেছে। তিন নম্বর কাজ করতে (P), (RD), (RI) ও (PS) এই চারটি উপাদান লেগেছে।
দলগত উপাদান তত্ত্বের দুর্বলতা হল এটি Spearman-এর মতো কোনো সাধারণ উপাদানকে স্বীকার করেনি।

উপরোক্ত সবগুলো বুদ্ধি সামর্থ্যই যে প্রত্যেক কাজে লাগে তা নয়। কোনো কাজে হয়তো এই সাতটির চারটি আবার অন্য কোনো কাজে হয়তো অন্য কয়েকটি শক্তির প্রয়োজন হয়। Thurstone-এর মূল বক্তব্য হল যে বুদ্ধি একাধিক মৌলিক সামর্থ্যের সমবায়ে গঠিত।

টিপ্পনী

Thurstone উপাদান বিশ্লেষণের মাধ্যমে ছাত্রদের সাফল্যের বিশ্লেষণ করে উপরোক্ত সামর্থ্যগুলো বার করেছেন। অবশ্য উপসংহারে তিনি বলেছেন যে সাতটি মৌলিক শক্তি বা সামর্থ্যের উল্লেখ করেছেন তা চরম বা অপরিবর্তনীয় নয়। পরবর্তীকালে মনোবিজ্ঞানীদের পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে আরও কয়েকটি উপাদানের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। Guilford, Burt প্রমুখ মনোবিজ্ঞানী প্রাথমিক সামর্থ্য নিয়ে বহু পরীক্ষা করেছেন। Thompson বুদ্ধির একটা নতুন তত্ত্ব বার করেছেন। একে বাছাই তত্ত্ব (Sampling theory) বলা হয়। এই মতবাদ অনুযায়ী মানুষের মন অসংখ্য শক্তিতে ভরপুর, কোনোটির স্বকীয়তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এগুলোকে আমাদের মানসিক শক্তির একক বলে বর্ণনা করতে পারা যায়। যখন আমরা কোনো একটা মানসিক কাজ করি তখন ওই অসংখ্য শক্তিকণার মধ্যে কতকগুলো একসঙ্গে জোট বাঁধে এবং ওই কাজটি করতে আমাদের সাহায্য করে। কীভাবে এবং কোন্ কোন্ শক্তি কণাগুলো একটা বিশেষ কাজ করার সময় জোট বাঁধবে তা নির্ভর করে ওই কাজটার প্রকৃতির ওপর এবং শক্তি কণাগুলোর অন্তর্নিহিত ক্ষমতার ওপর।

যেহেতু এই তত্ত্বটিতে বহু শক্তির অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়েছে সেহেতু Thorndike এটিকে 'বহু শক্তি তত্ত্ব' (Multifactor theory) বলে বর্ণনা করেছেন। Thompson এবং Thorndike-এর মতবাদ দুটি মূলত অভিন্ন।

বুদ্ধি সম্বন্ধীয় তত্ত্বগুলো আলোচনা করে দেখা গেল যে-কোনো তত্ত্বই সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধিকে বিশ্লেষণ করতে পারেনি এবং প্রত্যেকটি এখনও পরীক্ষণের পর্যায়ে আছে মানুষের ক্ষমতা ও সামর্থ্যের মধ্যে কোন্গুলো ঠিক সহজাত এবং কোন্গুলো পরিবেশের প্রভাবে বিকশিত তা সঠিকভাবে কোনো তত্ত্বই বার করতে পারেনি। অভিজ্ঞতা সামর্থ্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটায় এবং বিভিন্ন অভীক্ষার পারস্পর্যের ফলগুলো অভিজ্ঞতার ফলে পরিস্ফুট হতে দেখা গেছে। এর অর্থে এই নয় ব্যক্তিকে ব্যক্তিতে বুদ্ধির ব্যাপারে প্রভেদ নেই। তবে যে সকল মানসিক উপাদানের কথা বলা হয়েছে সেগুলো ঠিক সহজাত কিনা সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। যেমন বাচনিক সামর্থ্যকে একটা উপাদান বলা হয়েছে। তখন এই বাচনিক সামর্থ্য কি সহজাত সামর্থ্য না পরিবেশ জাত সামর্থ্য আমাদের মনে হয় দুটোই অল্পবিস্তর এই সামর্থ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। কারণ উত্তম পরিবেশ ভিন্ন জন্মগত বাচনিক সামর্থ্য কখনও পরিস্ফুট হবে না। সুতরাং বুদ্ধিকে নির্দিষ্ট উপাদানে ভাগ করলে বুদ্ধি সম্পর্কীয় সমস্যার সমাধান হয় না।

উপরোক্ত বিভিন্ন মতবাদ সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, অভীক্ষা মনোবিদ্যা (Test psychology)-য় তাদের চূড়ান্ত বিচার হয়ে থাকে। অভীক্ষা বা পরীক্ষার সাহায্যে প্রাপ্ত বুদ্ধির কার্য বা ফল দিয়েই এই চূড়ান্ত বিচার হয়, শুধু তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দিয়ে হয় না।

সৃজনশীলতা প্রত্যয় ও উপাদান (Creativity-Concept & Factors)

■ ভূমিকা ঃ

টিপ্পনী

সাধারণ মানুষ মনে করে বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, খেলাধূলা প্রভৃতির মধ্যে অসাধারণ কিছুর প্রকাশ হল সৃজনশীলতার দ্যোতক। আর যিনি প্রকাশ ঘটান তাঁকে সৃজনশীল ব্যক্তি বলা হয়। আবার মনোবিজ্ঞানীদের মতো কোনো ব্যক্তি যদি নিজস্ব আচরণ, চিন্তা-ভাবনা এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারেন সেটাই সৃজনশীলতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। মনোবিজ্ঞানী Ausubel মনে করেন যে-কোনো সৃজনশীল ব্যক্তি বিরল এক নতুনত্বের অধিকারী; এটাই আচরণের ক্ষেত্রে তাকে সম্পূর্ণ নতুন এক পথের সন্ধান দেয় এবং তা অন্যান্যদের আচরণের থেকে সম্পূর্ণ রূপে পৃথক।

'সৃজনশীলতা'-এই প্রত্যয়টি আমরা নিশ্চয়ই সবক্ষেত্রে প্রয়োগ করি না। আমরা কিছু ব্যক্তিকে সৃজনশীল বলে মনে করি। তাদের মধ্যে আমরা সর্বাগ্রে শিল্পীর (Artist) নাম উল্লেখ করতে পারি। তাঁর সৃজনশীল মননশীলতার ছাপ তাঁর সৃষ্টিধর্মী অঙ্কনে এবং ভাস্কর্যের মধ্যে ফুটে ওঠে। আমরা যেভাবে শব্দটাকে দেখছি তাতে বোঝা যাচ্ছে যে মানুষের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জগতে সৃজনশীলতার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সৃজনশীলতা না থাকলে সমাজের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায়। এমনকি সৃজনশীল কার্যাবলির অভাব দেখা দিলে সমাজের শিক্ষাব্যবস্থাও স্থিতিশীল হয়ে পড়ে। যত বেশি সমাজস্থ মানুষের কার্যাবলির মধ্যে সৃজনশীলতার ছাপ থাকবে এবং যতই পুরোনো চিন্তাধারাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারা যাবে ততই মানুষের মধ্যে সৃজনশীল আচরণ দেখা যাবে।

■ সৃজনশীলতার বৈশিষ্ট্য ঃ

মনোবিজ্ঞানী Rogers মনে করেন যে সৃজনশীল প্রক্রিয়ার মধ্যে কমপক্ষে তিনটি বস্তু থাকবেই। একটি দৃশ্যমান বস্তু যেটি সৃজনশীল প্রক্রিয়া থেকে প্রসূত হয়েছে। এই বস্তুটি অবশ্যই একটা নতুন সৃষ্ট বস্তু। বলাবাহুল্য যে বস্তুটির নতুনত্ব সৃজনশীল ব্যক্তির চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে এসেছে। সৃষ্টির মূলে কোনো গণিত কাজ করে না। যেমন, এইভাবে আচরণ করলে বা কাজটা এইভাবে করলে সেটা একটা নতুন বস্তু সৃষ্টি করবে - এটা আমরা বলতে পারি না। কারণ যে প্রক্রিয়ায় আর দশজন শিল্পী ছবি আঁকেন, ঠিক সেই প্রক্রিয়াতে ছবি এঁকে একজন সৃজনশীল শিল্পী একটি অভিনব ছবি এঁকে দিতে পারেন। Rogers-এর চিন্তাধারাকে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে দেখতে পাই যে সৃজনশীল ব্যক্তির একটা নিজস্ব অনন্যতা থাকে এবং তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য থেকে বেরিয়ে আসে কোনো সম্বন্ধমূলক সৃষ্ট বস্তু। Rogers তাঁর চিন্তাধারায় সৃজনশীলতার ব্যাখ্যায় কোনোরূপ ভালোত্ব বা মন্দত্বের মধ্যে পার্থক্য করেননি। কোনো কঠিন রোগ নিরাময় করার পদ্ধতির আবিষ্কার বা মানুষ খুন করার অভিনব উপায় উদ্ভাবন - দুটোই সমানভাবে সৃজনশীল সৃষ্টি। সামাজিক মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে ভালো সৃষ্টি ও মন্দ সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য করা হয়ে থাকে। Gallelio তাঁর সময়ে যা আবিষ্কার করেছিলেন তা সেই সময়ের পটভূমিতে অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তা একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিল।

মনোবিজ্ঞানী Guilford সৃজনশীলতার ওপর ব্যাপক গবেষণা করেন এবং তিনি কতকগুলো প্রাথমিক প্রলক্ষণ (Primary trait) উল্লেখ করেন। যথা, চিন্তার সাবলীলতা (Fluency of thinking), নমনীয়তা (Flexibility), স্বকীয়তা (Originality), পুনর্ব্যাখ্যান (Redefinition) ও সম্প্রসারণ (Elaboration)।

আমরা চিন্তার সাবলীলতা বলতে মোটামুটিভাবে চিন্তার উর্বরতাকে বোঝাই। এই সাবলীলতা আবার বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যেমন, শব্দমূলক সাবলীলতা (Word fluency), অনুষঙ্গমূলক সাবলীলতা (Associational fluency), অভিব্যক্তিমূলক সাবলীলতা (Expressional fluency), ভাবমূলক সাবলীলতা (Identical fluency)। প্রথমটা হল নতুন শব্দ সৃষ্টি করার শক্তি। দ্বিতীয়টি হল প্রদত্ত শব্দটির অর্থ বুঝে সমার্থক শব্দ বার করা। তৃতীয়টি হল কত দ্রুত এবং কত সুষ্ঠুভাবে একজন ব্যক্তি প্রয়োজনীয় বাক্য বা বাক্যাংশ গঠন করতে পারে। চতুর্থটি হল ব্যক্তি তার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে দ্রুত ভাব সৃষ্টি করতে পারে।

টিপ্পনী

ব্যক্তিকে অবশ্যই নমনীয় হতে হবে। পুরোনো চিন্তাকে ত্যাগ করে নতুন চিন্তা গ্রহণ করতে হবে। এই নমনীয়তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে। কোনো রকম আড়ষ্টতা তার চিন্তাকে আটকায় না। অনেক সময় কোনো একটা সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে গতানুগতিক পন্থায় সম্ভব হয় না; তখন সেই পন্থা ছেড়ে নতুন পন্থা গ্রহণ করাই হল সংগতিমূলক নমনীয়তার বৈশিষ্ট্য। বলাই বাহুল্য, সৃজনশীল আচরণের ক্ষেত্রে এই সংগতিমূলক নমনীয়তা একান্তভাবে অপরিহার্য।

সৃজনশীলতার একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল স্বকীয়তা বা নিজস্বতা। এই সৃজনশীলতার মধ্যে স্বকীয়তা আছে কিনা তা জানার জন্য অভীক্ষা রয়েছে। অভীক্ষার্থীর প্রদত্ত প্রতিক্রিয়া থেকেই বোঝা যায় যে তার স্বীকায়তা আছে কিনা। অভীক্ষার্থী এমন প্রতিক্রিয়া বা উত্তর জ্ঞাপন করল যাতে আমরা কতকগুলো অপ্রচলিত প্রতিক্রিয়া পেলাম। এই প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই অভীক্ষার্থীর নিজস্বতা বা স্বকীয়তার পরিচায়ক।

কোনো পরিচিত বস্তুর পুরোনো ব্যাখ্যাকে ত্যাগ করে ওই বস্তুটিকে নতুন পন্থায় ব্যবহার করাও সৃজনশীলতার একটা উপাদান। একেই আমরা বলি পুনর্ব্যাখান। সবশেষে আমরা বলতে পারি সৃজনশীলতার আর একটা উপাদান হল বিস্তার। এর অর্থ হল ব্যক্তির প্রয়োজন হলে অতি স্বল্প পরিমাণের উপকরণ থেকে একটা পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা গঠন করতে সমর্থ হবে।

'সৃজনশীলতা' প্রত্যয়টিকে আমরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম এবং তার মধ্যে কী কী উপাদান আছে তাও দেখার চেষ্টা করলাম। তবুও কিছু প্রশ্ন মনের মধ্যে থেকে যায়। মানুষ যখন সৃষ্টিধর্মী চিন্তনের মধ্যে ব্যাপৃত থাকে তখন আমরা জানতে চেষ্টা করি সেটা কী এবং ওই ধরনের চিন্তায় ব্যাপৃত থাকার মূলে কী তাগিদ আছে। ভাবলে খুব লাগে কিছু ব্যক্তি উপন্যাস, নাটক, সংগীত ও সুর রচনা অথবা চিত্রকলা সৃষ্টি করতে পারে। কিছু বিজ্ঞানী কীভাবে উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রকল্প (Hypothesis) গঠন করার পর সেইসব প্রকল্পের সত্যতা যাচাই করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি (Experimental method) উদ্ভাবন করেন? গাণিতিক শৈলী অথবা দার্শনিক চিন্তার দক্ষতা কেউ কেউ অর্জন করে থাকেন আবার অনেকেই তা থেকে বঞ্চিত –ব্যাপারটি কী? এই যা কিছুই আমরা আলোচনা করছি সব ক্ষেত্রেই সৃজনশীল চিন্তা কাজ করে

চলছে। সৃজনশীলতা অথবা সৃষ্টি সংক্রান্ত কিছু কাজের মধ্যে ব্যক্ত হয়। যেমন সৃজনশীলতা চিন্তা কবিতা, ছবি, পরীক্ষণ এবং বিদগ্ধ রচনা যা মৌল (Original) সৃজনশীল অথবা কল্পনাপ্রসূত (Imaginative) রূপে অভিহিত হয়। সৃজনশীল সৃষ্টি বা রচনা যে সমস্ত মানুষের কল্পনা প্রসূত তাঁদের ব্যতিক্রমী ব্যক্তি হিসেবে মনে করি। তাদের সব কিছুই সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কর্মসূচি থেকে। ব্যাপারটা কী তাই? সৃজনশীল ব্যক্তি কি একজন বিশেষ ধরনের ব্যক্তি অথবা একজন ব্যক্তি যাঁকে অন্য সবাই এর থেকে বেশি দক্ষ মনে করা হয় তাঁর বিশেষ প্রশিক্ষণ, দক্ষতা অথবা ব্যক্তিগত জীবন পদ্ধতি (Style)-র জন্য? একজন সাধারণ ব্যক্তিও সৃজনশীল হতে পারেন যদি তাঁকে অনুকূল অবস্থার মধ্যে রাখা হয় তাঁর সুপ্ত ক্ষমতা এবং প্রতিভা বিকাশের জন্য।

টিপ্পনী

মৌলিক চিন্তাবিদ (Original thinker)-বা কি বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত বিকাশের সৃষ্টির সহায়ক? অথবা তাঁর কি 'প্রকৃতিদত্ত' কোনো গঠন রয়েছে যেটা তাঁকে সাধারণ মানুষের থেকে পৃথক করে? মনোবিজ্ঞানীরা এই প্রশ্নের সদুত্তর আজ পর্যন্ত দিতে পারেনি। একজন গড়পড়তা ব্যক্তি এবং প্রতিভাবান ব্যক্তির মধ্যে বহু পার্থক্য রয়েছে। বিভিন্ন কাজ, যেমন, চিত্রাঙ্কন এবং গণিত, বিজ্ঞান এবং কবিতা, সঙ্গীত এবং সামরিক কলাকৌশল (Strategy) এই সবগুলোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কারণ এই সব কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বিভিন্ন রকমের অবস্থা, দক্ষতা, সামর্থ্য, উদ্দেশ্য এবং চাহিদা। এদের মধ্যে আবার কিছু কিছু সাদৃশ্যও রয়েছে। কি অবস্থায় সৃজনশীল চিন্তন ঘটে থাকে? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন। 'The creative process' নামক গ্রন্থে একদল সৃজনশীল চিন্তাবিদ প্রক্রিয়া বা পদ্ধতির আলোচনা করেছেন; সেই বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তাঁরা কোনো কবিতা, উপন্যাস, চিত্রাঙ্কন অথবা গাণিতিক আবিষ্কার করবার বা লেখবার কথা ভাবেন। অনুরূপভাবে P. MC. Kellar তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Imagination and thinking'-এ সৃজনশীলতার অনুকূল অবস্থার ওপর একটা স্বতন্ত্র অধ্যায় রেখেছেন। সেখানে তিনি 'জীবন' থেকে আহৃত বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। Stephen Spender-ও তাঁর গ্রন্থ 'The making of poem'-এ তাঁর সৃজনশীল রচনার মূলে স্বজ্ঞা (Intuition) উৎস হিসেবে দেখিয়েছেন।

Patrick-কতকগুলো স্তরের উল্লেখ করেছেন যার মাধ্যমে সৃজনশীল চিন্তন বাহিত হয় ঃ

প্রস্তুতি (Preparation) ঃ কোনো সৃজনশীল ব্যক্তি যে সৃষ্টিধর্মী বিষয় বা বস্তুর রচনা বা গঠন করবেন তাঁর সঙ্গে আগে পরিচিত হতে হবে।

ক্রমিক বিকাশ (Incubation) ঃ সমস্যাটিকে ঠিকমতো সংজ্ঞায়িত করতে হবে; বেশ কিছু সংকেত (Suggestion) দেখা দিতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত আসল সৃষ্টি ধরা পড়ে।

দীপন (Illumination) ঃ একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থিরীকৃত হয় এবং চিন্তন কর্তা সেই লক্ষ্য মাথায় রেখে কাজ করতে শুরু করেন।

প্রতিপাদন (Verification) ঃ যে ফলাফল চিন্তাকর্তা পেলেন সেগুলো তিনি পুরোপুরি কাজে লাগালেন, সংশোধন করলেন, পরিবর্তিত করলেন এবং শেষ পর্যন্ত সমাপ্ত করলেন-এটি বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অন্য তথ্যানুসন্ধানীরা Patrick-এর এই অনুসন্ধানকে সমর্থন জানিয়েছেন। কেবলমাত্র একটা জায়গায় তাঁদের সঙ্গে Patrick-এর মতভেদ রয়েছে ঃ উপরোক্ত চারটি স্তরের পারম্পর্য

সবসময় রক্ষিত হয় না। এই প্রসঙ্গে R. Thomson বলেছেন, "চিন্তন গতিশীল, তীব্র এবং অসাধারণ ব্যক্তিগত ক্রিয়া। এটাকে কিছুতেই কোনো নির্দিষ্ট সূত্র বা আকারে বেঁধে ফেলা যায় না। কিছু সৃজনশীল চিন্তাবিদ আছেন যাঁরা নিয়মনিষ্ঠ, শৃঙ্খলা পরায়ণ, সুনির্দিষ্ট এবং যাঁরা তাদের পদ্ধতি ইচ্ছাপূর্বক উদ্দেশ্যের মাধ্যমে প্রয়োগ করে থাকেন।" ("Thinking is a dynamic, intense and highly personal activity which cannot be tied down to any formula or pattern which fits any individual case. Some creative thinkers are systematic, orderly, thorough and apply their techniques with deliberate purpose.")

টিপ্পনী

আবার কিছু চিন্তাবিদ রয়েছেন যাঁরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আবেগ (Impulse)-এর দ্বারা তাড়িত হয়ে থাকেন এবং তাঁদের উৎসাহব্যঞ্জক কাজকর্ম আমাদের সামনে তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে Mozart এবং Beethoven এর দুটি পরস্পরবিরোধী সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের সম্মুখীন হই। সংগীত যেভাবে Mozart-এর কাছে ধরা দিয়েছিল তিনি সেইভাবে লিখেছেন। সেই সংগীত শুনলে মনে হয় সেটা যেন তাঁর স্বজ্ঞা (Intution)-জাত।

শিক্ষা-মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে সৃজনশীলতার প্রশ্ন কেন ওঠে এবং তার প্রয়োগও কীভাবে সম্ভব হয় তা বোঝা দরকার। এ কথা ঠিক যে শিক্ষামনোবিদ্যা যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করুক না কেন তার কেন্দ্রবিন্দু হল শিক্ষায়তনে বিদ্যমান শিক্ষার্থী। উপস্থিত রয়েছেন শিক্ষকও। শিক্ষক শিক্ষাদানে ব্যস্ত এবং শিক্ষার্থী শোনার ও কিছু গ্রহণ করারও চেষ্টা করছে। আমরা জানি যে সব শিক্ষার্থী সমানভাবে গ্রহণ করতে পারে না, কেউ এগিয়ে থাকে, কেউ বা আবার পিছিয়ে থাকে। কেউ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় কেউ পারে না। শিক্ষার্থীর বুদ্ধিমত্তা এবং সৃজনশীলতা যে এক নয় তা মনোবিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদরা বহুদিন আগেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁরা আরও বুঝেছিলেন যে বুদ্ধি-অভীক্ষার দ্বারা সৃজনশীলতার পরিমাপ সম্ভব নয়। সেই জন্য সৃজনশীলতার চিহ্নিতকরণ (Identification)-এর বিশেষ ধরনের মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা গঠনের চেষ্টা করেন। Guilford-উদ্ভাবিত অভীক্ষা এখানে উল্লেখ করতে পারা যায়। একজন শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করা হল উঁচুর বিপরীত কী? তার উত্তর তৎক্ষণাৎ হবে ঃ 'নীচু' এটি শিক্ষার্থীর কেন্দ্রীভূত চিন্তা (Convergent thinking)। এই সুনির্দিষ্ট উত্তরটি ছাড়া আর কোনো উত্তর গ্রহণীয় নয়। যদি শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করা হয় নীচু বোঝায় এমন কয়েকটি শব্দের নাম করো। সে অনেকগুলো উত্তর দিতে পারবে ঃ সস্তা, অবহেলিত, দুঃখী ইত্যাদি। এটা বিকেন্দ্রীভূত চিন্তন (Divergent thinking)-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। Guilford-এর মতে যে শিক্ষার্থীর মধ্যে বিকেন্দ্রীভূত চিন্তার প্রাধান্য থাকে তাকে আমরা সৃজনশীল বলতে পারি।

Torrance-ও কিছু ভাষামূলক এবং কিছু চিত্রমূলক অভীক্ষা আবিষ্কার করেছিলেন। Torrance-এর মতে সৃজনশীলতার বিচারের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর শিল্পমূলক কৃতিত্বের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে তার সৃজনশীল কৃতিত্বের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার্থীরা অনেক সময় তাদের সৃজনমূলক কাজের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ পায় না। এখানে উপযুক্ত পরিবেশ বলতে প্রয়োজনীয় সুযোগ ও উপকরণাদিকে বোঝানো হচ্ছে। কোনো শিক্ষার্থীর ছবি আঁকার একটা তীব্র ঝোঁক রয়েছে; তার সেই শক্তি বিকাশের জন্য ছবি আঁকার সুযোগ এবং সাজসরঞ্জাম তাকে অবশ্যই দিতে হবে। দুঃখের বিষয় গতানুগতিক ও সাধারণ বিদ্যালয় এই সুযোগ যতখানি থাকা উচিত ততখানি থাকে না।

টিপ্পনী

উপসংহারে আমরা বলতে পারি সকল দেশের এবং সব সমাজেই ব্যক্তির সৃজনশীলতার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। একটা সমাজের অগ্রগতি মোটামুটি নির্ভর করে সমাজস্থ মানুষজন কী পরিমাণে নতুন বস্তু সৃষ্টি করতে পারল তার ওপর। সত্যি কথা বলতে কি মানব সভ্যতার অগ্রগতি মানুষের সৃজনমূলক আচরণের দ্বারাই সংগঠিত হয়ে থাকে। আমরা যতই সৃজনশীলতার গুণগান করি, একথা ঠিক যে সৃজনশীল কাজের মধ্যে যে উল্লেখযোগ্য সামর্থ পরিলক্ষিত হয় তার মূলে কী তা আমরা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি না। সমগ্র সত্তা হিসেবে মানব ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুব সীমিত। এর ফলে প্রতিভাবান এবং গড়পড়তা (Average) মানুষের মধ্যে যে পার্থক্য তার মূলে যে সমস্ত উপাদান রয়েছে সেগুলোকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি না। 'ব্যক্তিত্বের মনস্তত্ত্ব' (Psychology of personality) যেদিন দেখা যাবে যে অভিজ্ঞতা প্রসূত ভিত্তির ওপর রয়েছে সেদিন আমরা সৃজনশীল চিন্তনের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারব বলে মনে হয়। একজন ব্যক্তির সামর্থ্যকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে ব্যক্তিত্বের উপাদান; শুধুমাত্র সামর্থ্য নয়, ব্যক্তির প্রতিভার মূলেও কাজ করে ব্যক্তিত্ব। দৈনন্দিন জীবনে তিনি যে কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন সেটা অনেকটাই নির্ভর করে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপাদানের ওপর।

১) বুদ্ধির সর্বব্যাপকতা ঃ

বুদ্ধির উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে বুদ্ধির উপযোগিতা সম্বন্ধে একটি মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। প্রাচীন দার্শনিকেরা মনে করতেন যে সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই বুদ্ধি মানুষের মধ্যে নিহিত থাকে। কিন্তু বিবর্তন প্রক্রিয়ার উপর জীবতত্ত্ববিদ্‌দের আধুনিক গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে প্রাণী-বিকাশের আদিমতম স্তরে বুদ্ধির কোনও অস্তিত্ব ছিল না। তখন পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে প্রাণীর একমাত্র অস্ত্র ছিল তার সহজাত প্রবৃত্তি। খাদ্য অন্বেষণ, বিপদ থেকে আত্মরক্ষা, বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি বেঁচে থাকার প্রাথমিক কাজগুলি নিছক প্রবৃত্তির দ্বারা সংঘটিত হত। কিন্তু পরিবেশ যতই জটিল হতে শুরু করল ততই প্রবৃত্তির কার্যকারিতা কমে আসতে লাগল। এই সময় প্রাণীর জীবনযুদ্ধে নতুন ও অধিকতর শক্তিশালী অস্ত্ররূপে তার মধ্যে দেখা দিল বুদ্ধি। এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে বুদ্ধির প্রাথমিক ও সর্বপ্রধান কাজ হল জটিল এবং নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে প্রাণীকে সাহায্য করা। মুখ্যত এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই বুদ্ধির উৎপত্তি হয়েছিল এবং আজও নতুন ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যখন মানুষের পুরাতন অভ্যস্ত আচরণ তার কার্যকারিতা হারায় তখন বুদ্ধিই তাকে বাঁচিয়ে রাখে।

প্রবৃত্তির কাজ হল পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে প্রাণীকে সাহায্য করা। কিন্তু যেখানে প্রবৃত্তি ব্যর্থ হয় সেখানে বুদ্ধি সফল হয়। তার কারণ হল বুদ্ধির ব্যাপক পরিবর্তনশীলতা। প্রবৃত্তির প্রচেষ্টা যান্ত্রিক এবং সঙ্কীর্ণ গন্ডীর মধ্যে এর কাজ সীমাবদ্ধ। বুদ্ধির প্রচেষ্টা বৈচিত্র্যধর্মী এবং তার কর্মপরিধি সীমাহীন।

২) নতুন ও পরিবর্তিত পরিবেশে সঙ্গতিসাধন ঃ

নতুন ও পরিবর্তিত পরিবেশে মানিয়ে নিতে প্রাণীকে সাহায্য করা যে বুদ্ধির সর্বপ্রথম কাজ এটা সকল মনোবিজ্ঞানীই মেনে নিয়েছেন। বার্ট[1] বলেছেন যে বুদ্ধি হচ্ছে দেহ ও মনের মধ্যে নতুন সম্বন্ধ স্থাপনের মাধ্যমে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিসাধনের সাধারণধর্মী শক্তি

বিশেষ। গডার্ড[2] বলেন যে বুদ্ধি প্রাণীকে তার আসন্ন সমস্যার সমাধান করতে ও ভবিষ্যৎ সমস্যার ধারণা গঠন করতে সাহায্য করে। স্টার্নের[3] মতে নতুন পরিস্থিতি এবং সমস্যার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতাই হল বুদ্ধি।

৩) মানসিক প্রক্রিয়াগুলির উন্নততর ব্যবহার ঃ

বুদ্ধির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল যে বুদ্ধি ব্যক্তিকে বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলির উন্নততর ব্যবহারে সমর্থ করে। প্রত্যেক ব্যক্তিই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সামর্থ নিয়ে জন্মায়। যেমন, সংবোধন, চিন্তন, বিচারকরণ, অনুমান, সমস্যা-সমাধান প্রভৃতি। এগুলির উন্নত ব্যবহার দেখা যায় পরিবেশের সঙ্গে অধিকতর সুষ্ঠু এবং কার্যকর সঙ্গতিসাধন। পরিবেশে বহুধর্মী শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ও বাস্তব সমাধানে নিযুক্ত করতে পারে একমাত্র মনের এই বিভি প্রক্রিয়াগুলির উন্নত ব্যবহার।

টিপ্পনী

উদাহরণস্বরূপ, চিন্তন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে এটি আমাদের মূর্ত আচরণের একটি মানসিক ও অমূর্তরূপ বিশেষ। অর্থাৎ যখন প্রকৃতপক্ষে 'কলকাতা থেকে দিল্লী' যাওয়া কাজটি আমরা মনে মনে সম্পন্ন করি তখনই আমরা বলি যে 'কলকাতা থেকে দিল্লী যাওয়া' সম্বন্ধে চিন্তা করছি। অথচ মনে মনে কাজটি সম্পন্ন করার ফলে আমাদের সময় ও পরিশ্রম অনেক কম লাগে এবং কোনরূপ পার্থিব বাধা আমাদের প্রচেষ্টায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না। আর সত্যকারে কলকাতা থেকে দিল্লী যেতে যে দীর্ঘ সময় লাগে সেই সময়ের মধ্যে ঐ রকম লক্ষ লক্ষ চিন্তা সম্পন্ন করা আমাদের পক্ষে খুবই সম্ভব। বুদ্ধিই চিন্তন-প্রক্রিয়ার এই অপরিমিত শক্তি ও সম্ভাবনাকে বাস্তব সমস্যার সমাধানে কাজে লাগাতে পারে। যখন প্রাণী কোনও একটি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন সেই সমস্যা সমাধানের যতরকম পন্থা আছে সেগুলি সে চিন্তনের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখতে পায় এবং তার মধ্যে যেটিকে সে সবচেয়ে কার্যকর বলে মনে করে সেটিকে সে তার সমস্যার সমাধানে বাস্তবক্ষেত্রে নিয়োজিত করতে পারে। একেই বুদ্ধির প্রয়োগ বলা হয়। সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে কোন চিন্তাশক্তির ব্যবহার নেই বলেই তার প্রচেষ্টা নূতনত্ববিহীন চিরনির্দিষ্ট এবং যান্ত্রিক। এই রকম বিচারকরার অনুমান প্রভৃতি অন্যান্য মানসিক প্রক্রিয়াগুলির উন্নততর ব্যবহার বুদ্ধির সাহায্যেই সম্ভবপর।

৪) অমূর্ত চিন্তন ঃ

প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী টারম্যানের ভাষায় বুদ্ধি হল অমূর্ত বা বস্তুবিবর্জিত চিন্তন করার ক্ষমতা চিন্তনের সময় সাধারণত আমরা ভাষা, প্রতিরূপ প্রভৃতি নানা মূর্ত বস্তুর সাহায্য নিয়ে থাকি। অনেক সময় আমরা এই ধরনের কোন মূর্ত বস্তুর সাহায্য ছাড়াই চিন্তা করতে পারি। যেমন, গণিত দর্শনের খুব সূক্ষ তত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করার সময় কোনরূপ মূর্ত বস্তুর ব্যবহার করা সম্ভব হয় না, সেখানে বিশেষ ধরনের অমূর্ত বস্তু বা মাধ্যমের সাহায্যে চিন্তন করা হয়। এই ধরনের চিন্তনগুলিকে অমূর্ত চিন্তন বলা হয় এবং বুদ্ধির সাহায্য ছাড়া এ ধরনের উন্নত প্রকৃতির চিন্তন সম্ভব নয়।

৫) সম্বন্ধমূলক চিন্তন ঃ

বুদ্ধির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এর দ্বারা সম্বন্ধ-নির্ণয়মূলক চিন্তন করা সম্ভব হয়।

দুই, দু'য়ের বেশী বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণার মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করার সময় বুদ্ধির সাহায্য অপরিহার্য। সম্বন্ধ যত জটিল হয় বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তাও তত বাড়ে।

প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী স্পীয়ারম্যানের দেওয়া বুদ্ধির সংজ্ঞাটিতে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয়কে বড় করা হয়েছে। তাঁর মতে বুদ্ধি বলতে বোঝায় ত্রিবিধ মানসিক প্রক্রিয়া সম্পাদনের শক্তি। যথা–

টিপ্পনী

(ক) অভিজ্ঞতার আহরণ;

(খ) সম্বন্ধের নির্ণয়ণ;

(গ) সম–সম্বন্ধ–বোধকের নির্ণয়ন।

স্পীয়ারম্যান মনের এই ত্রিবিধ প্রক্রিয়ার নাম দিয়েছেন জান–বিকাশের সূত্রাবলী। তাঁর মতে আমাদের জটিল অজটিল সমস্ত জ্ঞানই এই ত্রিবিধ পন্থায় অর্জিত হয়ে থাকে।

৬) উন্নত মানসিক সংগঠন ঃ

বুদ্ধির আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুযায়ী দেহ–মনের সবচেয়ে ভাল সংগঠন বা সমন্বয়ন সম্পন্ন করা। এর জন্য প্রয়োজন মনের সমস্ত দিক্‌গুলির মধ্যে সমন্বয়–সাধন করা এবং সেই লব্ধ সমন্বয়নের মাধ্যমে পরিবেশের সবচেয়ে উপযোগী প্রতিক্রিয়াটি নির্ণয় করা। প্রাণী যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন বুদ্ধিই তার বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে একটি সমন্বয় সৃষ্টি করে সেগুলিকে সুসংবদ্ধভাবে আসন্ন সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত করে। গেস্টাল্ট মতবাদী মনোবিজ্ঞানীরা বুদ্ধির এই মানসিক সংগঠন বা সমন্বয় সাধন করার উপরই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন।

৭) পৃথকীকরণ ও সামান্যীকরণ ঃ

বুদ্ধির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে এর দ্বারাই পৃথকীকরণ এবং সামান্যীকরণ নামে দুটি মানসিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। কোন বস্তু থেকে অপ্রয়োজনীয় গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলিকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি আলাদা করে নেওয়ার নাম হল পৃথিকীকরণ এবং সেই পৃথকীকৃত গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি সেই বস্তুর সমশ্রেণীভুক্ত অবশিষ্ট সকল বস্তুর উপর প্রয়োগ করারই নাম হল সামান্যীকরণ। বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে ধারণা গঠন করতে এই প্রক্রিয়া দুটি অপরিহার্য।

৮) বিচারকরণ ঃ আগমন ও নিগমন

বুদ্ধির আর একটি কাজ হল ব্যক্তিকে বিচারকরণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে সমর্থ করা। চিন্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোন সমস্যার সমাধান করার নামই বিচারকরণ। বিচারকরণ আবার দু'প্রকারের হতে পারে–আগমন ও নিগমন। প্রথম পদ্ধতিতে আমরা বিশেষ ঘটনার পর্যবেক্ষণ থেকে কোনও একটি সামান্য সত্যে বা সূত্রে পৌঁছই এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিতে একটি সামান্য সত্য থেকে কোনও একটি বিশেষ সত্যে বা সূত্রে আসি। দু'রকম বিচারকরণ পদ্ধতিই আমাদের নতুন জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞান বৃদ্ধির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং উভয় প্রক্রিয়াই আবার বুদ্ধির উপর

বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

৯) মানসিক প্রক্রিয়ার দ্রুততা ঃ

মানসিক প্রক্রিয়ার দ্রুততার সঙ্গেও বুদ্ধির একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। বিচারকরণ, অনুমান, সংবোধন প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলির দ্রুত সম্পাদন নির্ভক করে বুদ্ধির উপর। দেখা গেছে যে একই মানসিক প্রক্রিয়া স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি যে সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেটি তার চেয়ে অনেক কম সময়ে সম্পন্ন করে। যে কোন মানসিক কাজ সম্পন্ন করার দ্রুততা বা ক্ষিপ্রতা বুদ্ধির উপর নির্ভর করে বলে প্রমাণিত হয়েছে।

টিপ্পনী

১০) বর্তমান পরিস্থিতিতে অতীত জ্ঞানের প্রয়োগ ঃ

বুদ্ধি এবং জ্ঞান কিন্তু এক নয়। যা প্রাণী শিক্ষার মাধ্যমে লাভ করে তার নাম জ্ঞান। কিন্তু বুদ্ধি হল একটি মানসিক শক্তি এবং এটি সহজাত। তবু বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের একটি সম্পর্ক আছে। জ্ঞানের প্রয়োগ একমাত্র বুদ্ধির মাধ্যমেই সম্ভব এবং বুদ্ধিই অতীতের লব্ধ জ্ঞানকে বর্তমানের সমস্যা-সমাধানে নিযুক্ত করে থাকে। কেবলমাত্র জ্ঞান থাকলেই সমস্যার সমাধান করা যায় না, তার যথাযোগ্য প্রয়োগ করতে না পারলে সমস্যা সমস্যাই থেকে যায়। বুদ্ধিই অতীতে শেখা জ্ঞানকে বর্তমানে প্রয়োগ করতে পারে।

বুদ্ধির সংজ্ঞা

অতএব দেখা যাচ্ছে যে বুদ্ধি বলতে আমরা বুঝি এমন একটি সহজাত মানসিক শক্তি যা আমাদের নিম্নোক্ত কাজগুলি সম্পন্ন করতে সমর্থ করে।

১। নূতন এবং পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান
২। চিন্তন শক্তির উন্নততর ব্যবহার
(ক) অমূর্ত চিন্তন,
(খ) সম্বন্ধ ঘটিত চিন্তন,
(গ) পৃথকীকরণ ও সামান্যীকরণ
(ঘ) বিচারকরণ যা আবার দু'প্রকারের হতে পারে যথা-
(i) নিগমনমূলক ও
(ii) আগমনমূলক
৩। সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়াগুলির সুষ্ঠু সংগঠন
৪। অতীত জ্ঞানকে বর্তমান সমস্যার সমাধানে নিয়োজন এবং
৫। মানসিক কাজের দ্রুত সম্পাদন

যদিও প্রচলিত পন্থায় একটি বাক্যে বুদ্ধির সম্পূর্ণ সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়, তবুও বুদ্ধির উপরের সংজ্ঞাটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

বুদ্ধির বিভিন্ন তত্ত্ব

বুদ্ধি বলতে আমরা যা বুঝি সেটি একটিমাত্র শক্তি না একাধিক শক্তি এ সম্বন্ধে বিভিন্ন

ধারণা বহুদিন ধরে চলে আসছে। সেগুলি হল–

১। রাজতন্ত্রমূলক ধারণা

প্রথম ধারণা অনুযায়ী বুদ্ধি একটি একক শক্তি, যার অধীনে ও পরিচালনায় মনের অন্যান্য অসংখ্য শক্তি কাজ করে থাকে। এখানে বুদ্ধি যেন রাজা বিশেষ এবং অন্যান্য শক্তিগুলি তার প্রজাবৃন্দের মত। এই ধারণাকে বুদ্ধির রাজতন্ত্রমূলক ধারণা বলা চলতে পারে।

টিপ্পনী

২। অভিজাততন্ত্রমূলক ধারণা

দ্বিতীয় ধারণায় বুদ্ধিকে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শক্তির সমন্বয় বা সমাবেশ বলে কল্পনা করা হয়েছে। এই ধারণা অনুযায়ী কতকগুলি বিশেষধর্মী মানসিক শক্তি সম্মিলিত ভাবে সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করে। এই ধারণাটিকে অভিজাততন্ত্রমূলক ধারণা বলা যেতে পারে।

৩। গণতন্ত্রমূলক ধারণা

তৃতীয় ধারণায় বুদ্ধিকে এই ধরনের কোন একটি একক শক্তি বা কয়েকটি বিশেষ শক্তির সম্মেলন রূপে গ্রহণ করা হয় নি। তার পরিবর্তে মনের মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির অস্তিত্বের কল্পনা করা হয়েছে এবং এগুলির মিলিত শক্তিকেই বুদ্ধি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ধারণাকে বুদ্ধির গণতন্ত্রমূলক ধারণা বলা যেতে পারে।

বুদ্ধি সম্বন্ধে উপরের ত্রিবিধ ধারণা শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে বহুদিন ধরেই প্রচলিত আছে। কিন্তু গবেষণাভিত্তিক না হওয়ার জন্য এই মতবাদগুলিকে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করা হত না। কিন্তু আধুনিক কালের বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে বুদ্ধি সম্বন্ধে যে সকল মতবাদ পাওয়া গেছে সেগুলিকে অনুরূপ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। নীচে বুদ্ধির উপর এই তিনটি আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক তত্ত্বের বর্ণনা দেওয়া হল।

(ক) স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান-তত্ত্ব

প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী স্পীয়ারম্যানই প্রথম বুদ্ধি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রসূত একটি মতবাদ উপস্থাপিত করেন। তাঁর এই তত্ত্ব অনুযায়ী মানসিক সক্রিয়তা সম্পন্ন সমস্ত কাজের পেছনেই দু'শ্রেণীর মানসিক শক্তির নিয়োগ আছে। প্রথমটি হচ্ছে সাধারণ শক্তি। স্পীয়ারম্যান এই শক্তি নাম দিয়েছেন 'g' এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে কোন একটি বিশেষণধর্মী শক্তি, স্পীয়ারম্যান এটির নাম দিয়েছেন 's'। এই 'g'শক্তিটি সর্বগামী অর্থাৎ সমস্ত কাজেই তার প্রয়োগের প্রয়োজন হবে, যদিও অবশ্য এই নিয়োজিত 'g'র পরিমাণ 'g'কাজে সমান হবে না। আর 's' হল কোন বিশেষ কাজের উপযোগী একটি বিশেষধর্মী শক্তি এবং সেই বিশেষ কাজটি ছাড়া অন্য কোন কাজে সেই 's'টির প্রয়োগ হবে না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেক কাজের জন্য একটি স্বতন্ত্র 's' আছে। যেমন 'পড়া' কাজের জন্য পড়ার 's', 'অঙ্ক কষা' কাজের জন্য অঙ্ক কষার 's', 'বিচার করা' কাজের জন্য বিচার করার 's', ইত্যাদি। যেহেতু বিবিধতার দিক দিয়ে কাজ অসংখ্য রকমের হতে পারে, সেহেতু সংখ্যার দিক দিয়ে 's'-ও গণনাতীত হয়ে

থাকে। 'g' কিন্তু সংখ্যায় একটি, যদিও এর অনুপ্রবেশ সর্বত্র এবং অল্পমাত্রায় হোক বা অধিক মাত্রায় হোক সব কাজেই এর প্রয়োগ অপরিহার্য।

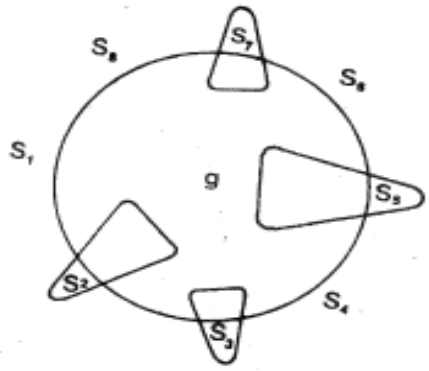

[স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্বের চিত্ররূপ]

স্পীয়ারম্যান কল্পনা করেছেন যে প্রত্যেকটি মানুষ যেন 'g'-র একটি নিজস্ব ভান্ডার নিয়ে জন্মায় এবং কোন কিছু করার সময় তা থেকে সে কিছু পরিমাণ 'g' নেয়, এবং সেই 'g' -এর সঙ্গে কাজে বিশেষ 's' টি যোগ করে দিয়ে সে সেই কাজটি সম্পন্ন করে। যেমন-

'পড়া' রূপ কাজ করতে লাগে 'g'র কিছুটা + 'পড়া'র 's'

'অঙ্ক কষা' রূপ কাজ করতে লাগে 'g'র কিছুটা + 'অঙ্ক কষা'র 's'ইত্যাদি।

স্পীয়ারম্যানের এই মতবাদটি ছবির মাধ্যমে পরিষ্কার বোঝান যায়।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন কাজের জন্য একটি বিশেষ 's'এবং কিছু পরিমাণ 'g'র প্রয়োজন হচ্ছে। বিভিন্ন কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী 'g'র পরিমাণও কম বা বেশী হচ্ছে।

দেখা যাচ্ছে যে স্পীয়ারম্যানের এই মতবাদ অনুযায়ী আমাদের সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়ার মূলে দুটি উপাদান বর্তমান। সেই জন্য এই মতবাদটিকে দ্বি-উপাদান তত্ত্ব বলা হয়।

বুদ্ধি সম্বন্ধে প্রাচীন রাজতন্ত্রমূলক ধারণার সঙ্গে স্পীয়ারম্যানের এই তত্ত্বটির তুলনা করা যায় কিন্তু প্রচলিত ধারণার মত স্পীয়ারম্যানের মতটি নিছক অনুমানপ্রসূত নয়। বিভিন্ন মানসিক কাজে ফলাফলের মধ্যে সহ-পরিবর্তনের মান নির্ণয় করে এবং জটিল গাণিতিক বিশ্লেষণের সাহায্যে স্পীয়ারম্যান তাঁর এই প্রসিদ্ধ তত্ত্বটিতে পৌঁছতে পেরেছেন। সেই জন্য এই তত্ত্বটি সুপ্রমাণিত ও নির্ভরযোগ্য।

দ্বি-উপাদান তত্ত্বের অসম্পূর্ণতা ও শ্রেণীমূলক শক্তি

দ্বি-উপাদান তত্ত্বের যে বর্ণনা উপরে দেওয়া হল সেটি হল স্পীয়ারম্যানের প্রাথমিক ব্যাখ্যা পরবর্তী গবেষণার ফলে

এই তত্ত্বটির কিছু অসম্পূর্ণতা ধরা পড়ে। স্পীয়ারম্যানের মতে মানসিক শক্তি দু'প্রকারের, 'g'-যা সব কাজের পেছনে থাকে, এবং 's'-যা কেবলমাত্র একটি বিশেষ কাজের পেছনে থাকে। এর মাঝামাঝি আর কিছুই নেই।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

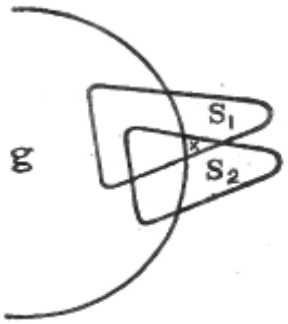

[শ্রেণীমূলক শক্তির চিত্ররূপ]

কিন্তু পরে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীর পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয় যে এমন কতকগুলি শক্তি আছে যেগুলি এই দু'ধরনের শক্তির মধ্যবর্তী অর্থাৎ যেগুলি 'g'র মত সব কাজে লাগে না বটে তবে 's'র মত কেবলমাত্র একটি বিশেষ কাজেও সীমাবদ্ধ থাকে না। এই শক্তিগুলিকে বিশেষ এক শ্রেণীভুক্ত কাজগুলি সম্পন্ন করার সময় দেখা যায় অর্থাৎ এরা 'g'র মত সর্বজনীনও নয় আবার 's'র মত সঙ্কীর্ণও নয়। এক কথায় এরা 'g'আর 's'র মাঝামাঝি এক ধরনের শক্তিবিশেষ। যেহেতু বিশেষ এক শ্রেণীর কাজগুলির ক্ষেত্রে এই শক্তিগুলি কার্যকর নয়, সেহেতু এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে শ্রেণীমূলক শক্তি। এই রকম একটি শ্রেণীমূলক শক্তি হল ভাষামূলক শক্তি। এটিকে 'g'র মত সব কাজে পাওয়া যায় না বটে তবে ভাষাঘটিত যত রকম কাজ আছে (যেমন- পড়া, লেখা, মুখস্থ করা, চিন্তা করা ইত্যাদি) সেগুলির সবের মধ্যেই এটি কিছু না কিছু পরিমাণে থাকে। যেমন- ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম কাজে $g+s_1$ লেগেছে এবং দ্বিতীয় কাজে $g+s_2$ লেগেছে। কিন্তু তাছাড়া আরও একটা শক্তি (x চিহ্নিত) এই দুটি কাজের মধ্যেই সমভাবে বর্তমান। প্রথমটি s_1 যদি 'লেখা' রূপ কাজ হয় এবং দ্বিতীয়টি (s_2) যদি 'মুখস্থ করা' রূপ কাজ হয় তবে এদের উভয় ক্ষেত্রেই শ্রেণীমূলক শক্তিরূপে থাকবে 'v' বা ভাষামূলক শক্তিটি।

এই রকম আরও কয়েকটি শ্রেণীমূলক শক্তির নাম হল গাণিতিক শক্তি, যান্ত্রিক শক্তি ইত্যাদি।

(খ) থার্স্টোনের প্রাথমিক শক্তি তত্ত্ব

প্রসিদ্ধ মার্কিন মনোবিজ্ঞানী থার্স্টোন বুদ্ধি বলে কোন একটি একক শক্তির অস্তিত্ত্ব স্বীকার করেন না। তার পরিবর্তে তিনি সাতটি মৌলিক বা প্রাথমিক শক্তির উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল-

১। ভাষাবোধ (V) ;
২। সংখ্যা ব্যবহার (N) ;
৩। স্মৃতি (M) ;
৪। আগমনমূলক বিচারকরণ (R) ;
৫। উপলব্ধিমূলক শক্তি (P) ;
৬। অবস্থানমূলক বোধ (S) ;

৭। শব্দ ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্য (W) ;

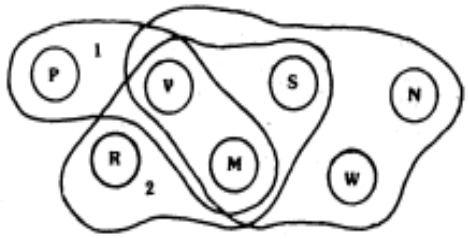

[থার্স্টোনের প্রাথমিক শক্তি তত্ত্বের চিত্ররূপ]

থার্স্টোনের মতে যাকে আমরা বুদ্ধি বলে থাকি তা আসলে সাতটি মৌলিক শক্তির সম্মিলিত রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্য সব কটি শক্তিই যে সব কাজেতে দরকার হয় তা নয়। এই সাতটি শক্তির মধ্যে কখনও বিশেষ কয়েকটি শক্তি একত্রিত হয়ে বিশেষ একটি কাজ সম্পন্ন করে। আবার আর কয়েকটি শক্তি একত্রিত হয়ে অন্য আর একটি কাজ সম্পন্ন করে ইত্যাদি। .....পৃষ্ঠায় থার্স্টোনের তত্ত্বটির একটি চিত্ররূপ দেওয়া হল।

ওই ছবিতে দেখা যাচ্ছে ১ নং কাজে লাগলো ভাষাবোধ (V), স্মৃতি (M) এবং উপলব্ধিশক্তি (P), আবার ২ নং কাজে লাগলো ভাষাবোধ (V), স্মৃতি (M), অবস্থানবোধ (S) এবং বিচারকরণ (R), আবার ৩ নং কাজে লাগছে ভাষাবোধ (V), স্মৃতি (M), অবস্থানবোধ (S), সংখ্যা ব্যবহার (N) এবং শব্দ ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্য (W) ইত্যাদি। বলা বাহুল্য কাজটির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে কোন্ কোন্ শক্তি কখন জোট বাঁধবে।

থার্স্টোনের তত্ত্বটি প্রাচীন বুদ্ধি সম্বন্ধে অভিজাততন্ত্রমূলক ধারণার সঙ্গে তুলনীয়। তবে থার্স্টোনের তত্ত্বও স্পীয়ারম্যানের তত্ত্বের মত জটিল গাণিতিক গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত।

(গ) টমসনের বাছাই তত্ত্ব বা থর্নডাইকের বহু-শক্তি তত্ত্ব

গডফ্রে টমসন নামে একজন ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী কিন্তু আগের দু'শ্রেণীর ব্যাখ্যার কোনটিই গ্রহণ করেননি। তিনি বুদ্ধির তৃতীয় ব্যাখ্যার জনক। তাঁর মতে বুদ্ধি বলে কোন একটি একক শক্তি নেই। তার পরিবর্তে মনের মধ্যে অগণিত শক্তিকণা আছে। এই শক্তিকণাগুলি অনির্দিষ্ট প্রকৃতির এবং কোনটিই পৃথক করে সংজ্ঞা বা বর্ণনা দেওয়া যায় না। এগুলিকে আমাদের মানসিক শক্তির একক বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। যখন আমরা কোন একটি মানসিক কাজ করি, তখন এই অসংখ্য শক্তি-কণার মধ্যে কতকগুলি একসঙ্গে জোট বাঁধে এবং ঐ কাজটি করতে আমাদের সমর্থন করে। কিভাবে এবং কোন্ কোন্ শক্তি কণাগুলি একটি বিশেষ কাজ করার সময় জোট বাঁধবে তা নির্ভর করে ঐ কাজটির প্রকৃতির

উপর এবং শক্তি কণাগুলির অন্তর্নিহিত ক্ষমতার উপর। এই জন্য টমসনের এই তত্ত্বটিকে স্যাম্প্লিং থিয়োরি বা 'বাছাই তত্ত্ব' বলা হয়।

আবার যেহেতু এই তত্ত্বটিতে বহুশক্তির অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়েছে সেহেতু প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী থর্নডাইক এটিকে মাল্টিফ্যাক্টর থিয়োরি বা বহুশক্তি তত্ত্ব বলে বর্ণনা করেছেন।

টিপ্পনী

টমসন ও থর্নডাইকের তত্ত্ব দুটি মূলত অভিন্ন।.....পৃষ্ঠায় টমসনের শক্তিকণা তত্ত্ব বা থর্নডাইকের বহু-শক্তিতত্ত্বের একটি কল্পিত চিত্র দেওয়া হল। দেখা যাচ্ছে যে তিনটি বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তিকণার দল বিভিন্ন ভাবে একত্রিত হয়ে কাজগুলি সম্পন্ন করছে।

টিপ্পনী

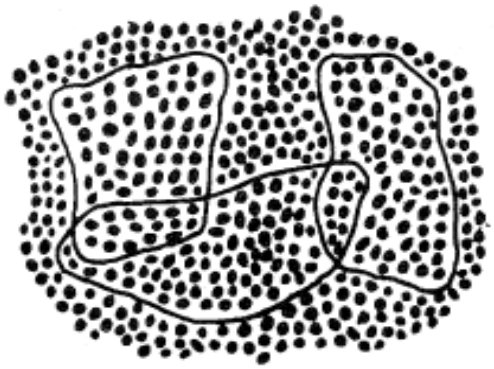

[টমসনের বাছাই তত্ত্ব বা থর্নডাইকের বহুশক্তি-তত্ত্বর কল্পিত চিত্ররূপ]

একক – ৩ ব্যক্তিত্ব (Personality)

■ ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা (Definition of Personality)

ইংরাজি 'Personality' শব্দটার উৎস ল্যাটিস Persona অর্থাৎ অভিনয় ব্যবহৃত মুখোশ (Mask)। এদিক থেকে দেখতে গেলে ব্যক্তিত্ব বলতে আসল ব্যক্তিত্ব বোঝায় না পরন্তু ব্যক্তির নকল বা মিথ্যা রুপকে বোঝায়। পরবর্তী কালে ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির আসল রুপকে না বুঝিয়ে নাটকে অভিনীত রুপ বোঝায়।

টিপ্পনী

ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা সীমহীন ব্যক্তির এমন কোনো প্রকাশ বা ধর্ম নেই যা তর ব্যক্তিত্বের মধ্যে পড়ে না। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব একটা সর্বান্তভাবীস্বভাব। সেই জন্যে ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা নিরূপণ করা দুরূহ ব্যাপার। *Allport* ব্যক্তিত্বের প্রায় পঞ্চাশটা সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন।

এই সমস্ত সংজ্ঞা একত্রিত করে বিচার করল ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কয়েকটা ধারণা আমাদের কাছে পরিস্কার হয়। যেমন মনোবিদ্যায় ধরে নেওয়া হয় ব্যক্তিত্ব একটা নিস্ক্রিয় সত্তা মাত্র নয়। এটি সর্বদা আচরণ বা ক্রিয়ার মধ্যেপ্রকাশিত হয়। ব্যক্তি কী করে বা কীরুপে সক্রিয় হয় তাই ব্যক্তিত্বের দ্যোতক। ব্যক্তিত্ব যে সকল ক্রিয়ার বাগুণে প্রকাশিত হয় তার সমষ্টিই হল ব্যক্তিত্ব।

উপরিউক্ত অর্থ বোঝাতে গিয়ে ***Woodworth*** বলেছেন "ব্যক্তির আচরণের সমগ্র রুপটাই তার ব্যক্তিত্ব" । কিন্তু এ কথাও ঠিক যে কতকগুলো পরস্পর বিছিন্ন গুণাবলির সমষ্টি ব্যক্তিত্ব নয় পরন্তু ব্যক্তিত্ব হল তাদের ঐক্য বা সমগ্রতা ব্যক্তির বহুমুখী প্রকাশ গুলোকে এমন ভাবে গ্রথিত করে ব্যক্তিত্ব যে তা একই ব্যক্তির প্রকাশ রুপে পরিচিত হয়।

Watson প্রমুখ আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানী এবং ***Woodworth*** ব্যক্তিত্বের সক্রিয়তা স্বীকার করেন। তাঁরা মনে করেন উদ্দীপক (Stimulus) এর সঙ্গে জৈব জীব (organism) এর প্রতিক্রিয়া (reaction) র সমষ্টি হল ব্যক্তিত্ব। এই প্রতিক্রিয়ার কাজ হল জীবের সঙ্গে পরিবেশের প্রতিযোজন (adaptation) আবার প্রতিযোজনের মধ্যস্থ (meium) হল স্নায়ুতন্ত্র (nervous system) ***Watson*** এর মতে উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন স্নায়ুবিক গঠন। আবার ***Allport*** মনে করেন যে ব্যক্তির যে গুণগুলো তাকে অন্য ব্যক্তির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ করে তার সমষ্টিই হল ব্যক্তিত্ব। কোনো মনোবিজ্ঞানীর মতই সার্থক ভাবে ব্যক্তিত্বের স্বরুপকে ফুটিয়ে তুলতে পারে না। কিছু না কিছু ত্রুটি রয়েই গেছে তাদের চিন্তাধারার মধ্যে। যেমন ***Allport*** এর সংজ্ঞার মধ্যে রয়েছে দোষ। ব্যক্তিত্ব শুধুমাত্র তাদের ব্যক্তির ওপর প্রভাব বিস্তার করার সামর্থ্য হতে পারে না। নামিদামি প্রতিষ্ঠানের নিকট নতি স্বীকার করার সামর্থ্যও হল ব্যক্তিত্ব।

সব দিক বিচার করে আমরা বলতে পারি যে ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির শরীর গ্রন্থির মানসিক সংগঠন যার ফলে নানা প্রকাশ বৈচিত্র্য সত্ত্বেও অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যের মতো কাজ করে। এক কথায় ব্যক্তিত্ব হল সমগ্র ব্যক্তির সাধারণ ধর্ম । এই প্রসঙ্গে আমরা আর একটা কথা ***Guilford*** এর মত অনুযায়ী উল্লেখ করতে পারি। তা হল ব্যক্তিত্ব কারও ব্যক্তিগত স্বত্ত্ব personal possession নয় সবার মধ্যে ব্যক্তিত্ব বিরাজ করে। কেবল মাত্র পার্থক্য হল গুণগত।

■ ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য (characteristics of personality)

ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গেলেই অনেক মনোবিজ্ঞানীর চিন্তাধারা মাথায় আসে কিন্তু এদের মধ্যে মনে হয় খুব উল্লেখযোগ্য হল ***Eysenck*** এর মতবাদ কী উল্লেখযোগ্য দিক তাঁর মতবাদে? তিনি একই সঙ্গে ব্যক্তিত্বের শ্রেণিভেদ ***personality type*** ও প্রলক্ষণ ধারা types of trait কে তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। প্রথমটার বৈশিষ্ট্য হল সমস্ত ব্যক্তিকেই কোনো না কোনো শ্রেণিভুক্ত করা যায় একসঙ্গে কোনো মানুষ দুই শ্রেণিভুক্ত হতে পারেনা। দ্বিতীয়টা হল ***Allport*** এর প্রলক্ষণ ধারা এক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সব কটা প্রলক্ষণ বিদ্যমাণ। কিন্তু এই প্রলক্ষণ গুলোর কমবেশি উপস্থিতি এক ব্যক্তিকে অপরের থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করে।

টিপ্পনী

সর্বাগ্রে ***Eysenck*** মানুষকে তিনটি শ্রেণি অনুযায়ী ভাগ করে নিতে চেয়েছেন। সব মানুষকে তার সামগ্রিক আচরণের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তিনটে প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করে নিলে সেই শ্রেণির অন্তর্গত প্রলক্ষণ গুলো তার মধ্যে পরিমাপ করা সহজ হবে। ***Eysenck*** এর মতে ব্যক্তিত্ব তিনটি মৌলিক মাত্রা নিয়ে গঠিত। যেমন

১) অন্তর্মুখিতা বহির্মুখিতা introversion extroversion

২) স্নায়বিকতা neuroticism এবং

৩) বাতুলতা psychoticism সকল ব্যক্তিত্বেই এই তিনটে মাত্রা কমবেশি পরিমাণ বর্তমান থাকে।

Eysenck মনে করেন ব্যক্তিত্ব স্তরে স্তরে বিন্যস্ত। সর্বনিম্ন স্তরে আছে নিদিষ্ট প্রতিক্রিয়া specific response যা সম্ভবত মানুষের প্রকৃত ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য সূচক নয়। যেমন কেউ কেউ চায়ে চিনি বেশি খায় কিংবা অনেকেই দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে ইত্যাদি দ্বিতীয় স্তরে আছে অভ্যাস মূলক প্রতিক্রিয়া habitual response। এই প্রতিক্রিয়াগুলো একই পরিস্থিতিতে বার বার ঘটে থাকে। এই গুলো ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য সূচক। তৃতীয় স্তরে আছে ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ যা অভ্যাসমূলক প্রতিক্রিয়ার এক একটি সমন্বয়।

■ ব্যক্তিত্বের বিকাশ (developmeent of personality)

১. দৈহিক কারণ

বিভিন্ন দৈহিক অবস্থার ওপর ব্যক্তিত্বের বিকাশ অনেকাংশে নির্ভর করে। ক্লান্ত বা ক্ষুধার্ত ব্যক্তি সহজেই রেগে যায়। যাদের রক্তসঞ্চালন অস্বাভাবিক তাদের অক্রিজেন কমে যায়। ফলে তারা কোনো কাজেই উৎসাহ বা প্রেরণা পায় না। পথ্যাদির পরিবর্তন উপবাস ব্যাধি প্রভৃতি কারণেও ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

২. রাসায়নিক কারণ

ব্যক্তির দেহ যেসব রস humour নিয়ে গঠিত তাদের রাসায়নিক মিশ্রণের ওপর ব্যক্তিত্বের

বিকাশ নির্ভর করে। এই রাসায়নিক মত বর্তমানে অচল। কিন্তু ব্যক্তিত্বের বিকাশে রাসায়নিক ক্রিয়া যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এই প্রাচীন মতটি সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

গ্রন্থির রসক্ষরণ ও ব্যক্তিত্ব

আবার গ্রন্থির রসরক্ষণ ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত করে। গ্রন্থি দুপ্রকার বহিঃক্ষরা গ্রন্থি duct gland এবং অন্তক্ষরা গ্রন্থি duct lessgland । বহিঃক্ষরা গ্রন্থি যে রসক্ষরণ করে তা শরীরের কোনো দ্বার বা প্রণালী দিয়ে বার হয়ে শরীরের ওপরে বা বাইরে উপচে পড়ে। যেমন লালা গ্রন্থি, স্বেদ গ্রন্থি , অশ্রু গ্রন্থি , মূত্র গ্রন্থি প্রভৃতি। ব্যক্তিত্বের বিকাশের ওপর নিশ্চয়ই তারাপ্রভব বিস্তার করে। গ্রন্থির রসরক্ষণের কমবেশির ওপর ব্যক্তির আচরণ বিশেষ ভাবে পরিবর্তিত হয়। এরুপ অবস্থায় ব্যক্তির সামাজিক আচরণ বদলে যেতে পারে। যেমন হয়তো সেই ব্যক্তি তার বন্ধুকে আঘাত বা অপমান করে বসে। হয়তো বা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করে চাকরি খোয়ায়।

টিপ্পনী

অন্তক্ষরা গ্রন্থির রসরক্ষণ ও ব্যক্তিত্ব ঃ

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলোর রসরক্ষণ ব্যক্তিত্বের ওপর বহুল পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে। এদের ক্ষরিত রস দেহের বাইরে যাওয়ার পথ পায় না। কাজেই তাদের ক্ষরিত রস রক্তের সঙ্গে মিশে শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। এই অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির মধ্যে যতগুলো আছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল থাইরয়েড গ্রন্থি , অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি এবং পিটুইটারি গ্রন্থি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য এবং তাদের রসরক্ষণও অধিক প্রভাবশালী।

৩. সামাজিক কারণ ঃ

আগেই আমরা দেখেছি ব্যক্তিত্ব একটা নিস্ক্রিয় সত্তা নয় কতকগুলো ক্রিয়ার সংগঠন বলাই বাহুল্য ব্যক্তি পরিবেশেই জন্মলাভ করে তার মধ্যেই বর্ধিত হয় এবং তার ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। পরিবেশিক environmental উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই সমাজ মোটামুটি দুটি শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় একটা হল সামাজিক বিধি social code এবং সামাজিক স্থান social role । ব্যক্তি সামাজিক বিধি নিষেধ মেনে চলে এবং সমাজে তার একটা নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে।

কিন্তু সমাজ বা গোষ্ঠীর বাঁধা ছাঁচে চলতে হলেও প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিকাশ লাভ করে। ব্যক্তিত্ব শুধু সমাজের সৃষ্টি নয় ব্যক্তির নিজস্ব স্বভাবেও ক্রিয়াশীল। আবার সমাজও ব্যক্তির সৃষ্টি নয়। সামাজিক জীবন বলতে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ inter personal relationship বোঝায়।

পরিবারে শিশুর স্থান ও কাজ তার ব্যক্তিত্বকে গভীরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। শিশুর পারিবারিক স্থান ও কাজ অনেকাংশে নির্ভর করে তার পিতা মাতার ওপর যদিও তার নিজস্ব স্বভাব উপেক্ষনীয় নয়। আদুরে ছেলে spoilt child প্রিয় সন্তান অথবা অবাঞ্ছিত সন্তান পরিবারে যে স্থান লাভ করে তা তাদের ব্যক্তিত্বের ওপর স্থায়ী ছাপ রেখে যায়।

একমাত্র সন্তান only child কোনো বাধা না পেয়ে অথবা কারও অংশীদার না হয়ে পরমুখা পেক্ষী বা অত্যাচারী হয়ে দাঁড়াতে পারে। এটা হল adler এর মতবাদ কিন্তু তাঁর মতবাদ যথার্থ

নয়। পরিবারে কোনো স্থান বা জন্মক্রম birth order ই শিশুর পক্ষে খারাপ নয়। তাছাড়া বিভিন্ন ক্রমে ভূমিষ্ঠ শিশুর ব্যক্তিত্বের সাদৃশ্য দেখা যায়। মূলকথা হল শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের চূড়ান্ত নিয়ামক পারিবারিক স্থান বা জন্মক্রম নয়। শিশুর গৃহ পরিবেশ এবং সহজাত স্বভাব ও তার ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে তবে একথা ঠিক যে adler জন্মক্রমেই ব্যক্তিত্ব বিকাশের একমাত্র কারণ রুপে স্বীকার করেননি তিনি অন্য হেতুগুলোকেও স্বীকার করেছেন। মা সন্তানকে কীরুপে সামাজিক জীবনে অভ্যস্ত করেন তার ওপর অনেকটা নির্ভর করে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ।
মনঃসমীক্ষক freud ও ব্যক্তিত্ব গঠনে পারিবারিক এবং সামাজিক প্রভাব স্বীকার করেছেন। সমালোচনা করা যেতে পারা যায় যে adlerএবং freud উভয়েই শিশুর সামাজিক জীবনকে পরিবারে সীমাবদ্ধ রেখেছেন কিন্তু গৃহ বা পরিবারের বাইরেও বৃহত্তর সমাজের প্রভাব কী রুপে শিশুর ব্যক্তিত্বকে গঠন করে তারা সেদিকে লক্ষ রাখেননি।

টিপ্পনী

৪. জৈব কারণ – বংশ প্রভাব (biological factors heredity)

ব্যক্তি বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে যা পায় তার গুরুত্ব অত্যধিক। বংশ গতি বলতে বোঝায় ব্যক্তিত্ব বিকাশের সেই কারণ গুলো যা শিশু জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছে অথবা যা জন্মগত। আরও স্পষ্ট ভাবে বলতে গেলে জন্মের কিঞ্চিদধিক নয় মাস পূর্ব ভ্রুনাবস্থায় প্রথম সূত্রপাত থেকে আরম্ভ করে জন্মকাল পর্যন্ত শিশুর মধ্যে যে সকল কারণ নিহিত থাকে সেগুলো তার ব্যক্তিত্ব বিকাশে বংশগত কারণ। অপরপক্ষ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরবর্তী মুহূর্ত থেকে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে যে সকল কারণ ক্রিয়া করে সে গুলো তার পরিবেশিক কারণ।

বংশগতি ব্যক্তিত্বকে বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে বংশগতি নির্দিষ্ট এবং পরিবেশ environment অনির্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করে। উন্নত পরিবেশে উৎকৃষ্ট বংশগত সম্ভাবনাগুলো বিকাশ লাভ করে। বংশগতি সূত্রে পাওয়া নয় এমন কোনো শক্তি বা সামর্থ্য পরিবেশ উৎপন্ন করতে পারে না। বংশগতি ব্যক্তিত্ব বিকাশের সকল সম্ভাবনার মূল কারণ পরিবেশ শুধু এই সম্ভাবনা গুলোর বাস্তব রুপায়ণে সহায়তা করে।

ব্যক্তিত্ব এবং ব্যক্তিগত বৈষম্য (Personality and individual differlnees)

ব্যক্তিগত বৈষম্য এর শিক্ষা মূলক তাৎপর্য (Individual differlnees- its cducclianaal significance)

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য যে আছে সে বিষয়ে প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তির মনে দ্বিধা নেই। তবে এই জটিল প্রকৃতির স্বরুপ বিশ্লেষনে আধুনিক মনোবিদ গন বিশেষ ভাবে সচেষ্ট । এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বা ব্যক্তিগত বৈষম্য কে মনোবিদ্যায় ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি principl of individual differlnees বলা হয়ে থাকে।

বিশেষ বয়সের শিশুরা মানসিক সামাজিক দৈহিক এবং প্রক্ষোভিক দিক থেকে একই ভাবে বিকশিত হয় বা তাদের মধ্যে বিকাশগত দিক থেকে মিল আছে সেই কথা মাথায় রেখেই আমরা

জীবন বিকাশের স্তর stage of human dlvelopment ভাগ করেছি। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে বিকাশের ধারা যদি এক হয় পার্থক্য কী করে আসে বা পার্থক্য কী করে থাকে? মানব জীবনের বিকাশের ধারার মিল দেখে তাদের কয়েকটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে মানব জীবনের বিকাশের স্তরে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মিল থাকলেও পার্থক্য অনেক থেকে যায় । তাই কতকগুলো দিক থেকে মানুষে মানুষে মিল আছে ঠিকই কিন্তু পার্থক্য তাদের মধ্যে বর্তমান। এই পার্থক্য ব্যক্তির স্বাতন্ত্রের পরিচায়ক এই জন্য মনোবিদ g. w allport তাঁর গ্রন্থ personality a psychological interprection এ বলেছেন পৃথিবীতে যত জন মানুষ আছে মনোবিদ গনের অনুশীলনের পদ্ধতিও তত রকম। কারণ হল প্রত্যেক মানুষই তার নিজস্ব ভঙ্গীতে প্রকৃতির সঙ্গে অভিযোজন করে যাচ্ছে। তাতে সামগ্রিক মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে অনুশীলন করলে ভুল বিবেচনা করা হবে। প্রকৃতির সঙ্গে অভিযোজন করতে গিয়ে তার যে নিজস্ব ভঙ্গী সে প্রকাশ করছে তাকে যদি যথা যথ ভাবে অনুশীলন করা না যায় তাহলে তার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে না।

টিপ্পনী

মনোবিদগণ মনে করেন পার্থক্য মানবপ্রকৃতির ধর্ম সুতরাং তাকে অস্বীকার করে যে মনোবিদ্যা গড়ে উঠবে তা হবে বাস্তব অভিজ্ঞতা বিবর্জিত কী ভাবে পার্থক্য হয় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সে সম্পর্কে জানাও হবে মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য। এই পার্থক্যের অনুশীলনের জন্যই মনো বিদ্যায় এক বিশেষ শাখা গড়ে উঠেছে যাকে বলা হয় পার্থক্য অনুশীলন কারী মনোবিদ্যা(Differential Psychology) Wundt, Cattle, jastrow , Kraepelin, Ebbinghause প্রভৃতি মনোবিদগণের প্রচেষ্টায় বর্তমানেপার্থক্য মূলক মনোবিদ্যা বিজ্ঞান সম্মূত ভাবে এই পার্থক্য অনুশীলন করছে।

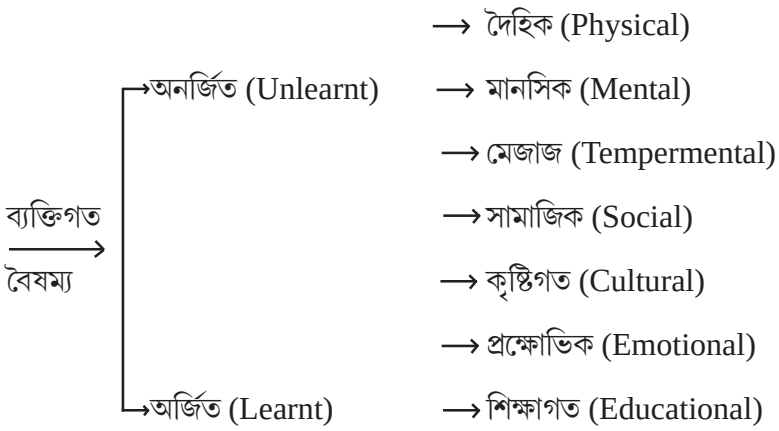

পার্থক্য ভিত্তিক মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য হল মানুষের পার্থক্যের বা বৈষম্য নীতি অনুশীলন করা। মনোবিদ্যার এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য স্বাভাবিক ভাবে শিক্ষা বিজ্ঞানকে প্রগতিক করেছে। আমরা যদি শিক্ষার উদ্দেশ্যের কথা ভাবি তাহলে দেখাযাবে আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তি জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করা। শিক্ষার্থীর নিজস্ব ক্ষমতা নুকারী জীবন বিকাশ সহায়তা করা শিক্ষার উদ্দেশ্য সুতরাং শিক্ষার্থীর নিজস্ব ক্ষমতা বা বৈদিনীর অনুশীলন করতে না পারলে তার বিকাশের জন্য কোনো রকম পরিকল্পনাই রচনা করা যাবে না তাই ব্যক্তিগত বৈষম্যের অনুশীলন শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীরা প্রথম যখন বিদ্যালয়ে আসে তখন তার মধ্যে থাকে কতকগুলো অর্জিত

ও অনর্জিত বৈশিষ্ট্য অর্জিত বৈশিষ্ট্য গুলো পারিবারিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত। এই সব বৈশিষ্ট্য গুলোকে প্রথম যদি শিক্ষক অনুশীলন করতে না পারেন তাহলে তিনি সার্থক ভাবে তাদের শিক্ষা দিতে পারবেন না। শিক্ষার উদ্দেশ্য কে সার্থক করতে হলে ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির ওপর ভিত্তি করে পাঠক্রম ও শিক্ষন পদ্ধতি রচনা করতে হবে। তা না করতে পারলে শিক্ষকের প্রকৃত দায়িত্ব পালন করা হবে না। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির বহুল প্রয়োগ দেখতে পাই।

টিপ্পনী

আধুনিক কালে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতিকে স্বীকৃতি দিয়ে বহুমুখী পাঠক্রমের ব্যবস্থাকরা হয়েছে। বিদ্যালয়ে বহুমুখী পাঠক্রমের উদ্দেশ্য হল প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিজস্ব অনুরাগ ও ক্ষমতা অনুযায়ী বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া এর ফলে ব্যক্তি জীবনে বিকাশও যেমন হয় অন্যদিকে শিক্ষার কাজও সহজ তর হয়।

আধুনিক শিক্ষাবিদরা বিভিন্ন ঘটনা থেকে এই বৈষম্যকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। অনুশীলন পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা ও অনুশীলন তুলনায় উন্নতর করে। এই শিখন সম্বন্ধে বিভিন্ন মনোবিদ একমত হতে পারেন না। কেউ কেউ যেমন Pavlov, Watson মনে করেন যে শিখন সাপেক্ষ প্রতিবর্ত (Contitioned reflex) বিশেষ। খাদ্য দেখলে কুকুরের স্বাভাবিক ভাবেই লালা ক্ষরণ হয় এবং ঘন্টায় শব্দ শুনলে একটা অস্থিরতা তার মধ্যে দেখা যায়। এখন কুকুরটাকে খাদ্য দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি ঘন্টা বাজানো হয় তাহলে দেখা যাবে যে কিছু পরে খাদ্য না দিয়েই কেবলমাত্র ঘন্টা বাজালেই তার লালা নিঃসরণ হতে থাকে। আলোচ্য উদাহরণে লালা নিঃসরণ হল স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। সেটা কৃত্রিম উদ্দীপক এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। প্রতিক্রিয়া এই স্বাভাবিক উদ্দীপক থেকে অস্বাভাবিক বা কৃত্রিম উদ্দীপকে সঞ্চালিত হওয়াকেই বলা হয় অনুবর্তন (conditoning)। Watson প্রমুখ চেষ্টিত মনোবিজ্ঞানী(Behaviouristic psychologist) রা এই সাপেক্ষ প্রতিবর্ত শিখন ক্রিয়ার দ্বারা সকল প্রকার শিখন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে থাকেন। তাঁদের মতে ব্যক্তির অভ্যাস অপছন্দ মনোভাব ভয় ঘৃণা প্রভৃতি সবই অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে থাকে। বস্তুত প্রক্ষোভ এর ক্ষেত্রে অনুবর্তনের প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটা লোমওয়ালা খেলনা কুকুর একটা ছেলেকে দিয়ে দেখা গেল যে সে একবারে ভয় পাচ্ছে না কিন্তু একটা বিকট শব্দ শুনলেই সে ভয়ে কেঁপে উঠছে। এবার লোমওয়ালা কুকুর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা জোরে শব্দ করা হল। এরকম কয়েক বার করা হল। বলাই বাহুল্য ছেলেটি কুকুরে হাত দিয়েই ভয়ে ফেলে দেয়। অতএব উচ্চশব্দ থেকে সৃষ্ট যে ভয় যেটা স্বাভাবিকপ্রতিক্রিয়া সেটা অনুবর্তিত হয়ে গেল কৃত্রিম উদ্দীপক লোমওয়ালা কুকুরে। হাত দিয়েই ভয়ে ফেলে দেয়। এই ভাবেই শিশুর ক্ষেত্রে ভয় অনুবর্তন প্রতিক্রিয়া মাধ্যমে অন্য বস্তুতে ছড়িয়ে পড়ে। শিশুর শিক্ষা যে মূলত সাপেক্ষ প্রতিবর্তের প্রতিষ্ঠা এবং অভ্যাসরুপ স্থায়ী সাপেক্ষ প্রতিবর্ত গঠন তা সাম্প্রতিক মনোবিদ্যার একটা স্বীকৃত সত্য। আবার Watson এও দেখিয়েছেন অর্জিত ভয় নঞর্থক সাপেক্ষী করণের সাহায্যে দূর করা যায়।

শিশুর স্বাভাবিক কৌতূহল অথবা জানবার ঔৎসুক্যকে নতুন বা অজ্ঞাত বস্তুতে জাগিয়ে তোলা যায়। যে বস্তুতে শিশুর স্বাভাবিক ঔৎসুক্য আছে তার সঙ্গে যাতে শিশুর স্বাভাবিক ঔৎসুক্য নেই সেই বস্তুর অনুষঙ্গ স্থাপনই এই মতে শিখনের স্বরুপ। উদাহরণ স্বরুপ শিশু পাখি কী তা জানে কিন্তু পাখির নামটি জানে না। তাকে একটি পাখি দেখিয়ে যদি কয়েকবার বলা হয় এইটা পাখি তবে তার পক্ষে পাখি কথাটি শিক্ষা করা সহজ হয়। এই ক্ষেত্রে শিশুর পাখি কথাটা

শিক্ষা পাখি বস্তুটির পূর্বজ্ঞানের অপেক্ষা রাখে।

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত মতে সকল শিক্ষাই সাপেক্ষ প্রতিবর্ত উচ্চতর শিক্ষার সঙ্গে সহজ বা সরল শিক্ষার পার্থক্য কেবল মাত্র জটিলতর এবং সহজতর সাপেক্ষপ্রতিবর্ত মধ্যে পার্থক্যের জন্য একটা নিয়মে শিশু পাখি কথাটিকে পাখির জ্ঞানের সাপেক্ষ করে শিক্ষা করে।

প্রয়োগিক মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে Watson,Lashley প্রমুখ চেষ্টিত বাদীদের ধারণা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। তারা শিক্ষাকে এর ন্যায় মূলত সাপেক্ষ প্রতিবর্ত রুপে স্বীকার করেছেন। একথা ঠিক যে এই গবেষণা শিশু শিক্ষা ক্ষেত্রে যুগান্তর ঘটিয়েছে। পূর্বে শিক্ষা ব্যাপারটা অস্পষ্ট ছিল কিন্তু বর্তমানে এটা যে আরও স্পষ্ট হয়েছে তার মূলে রয়েছে সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদে অসীম প্রভাব। আবার একটাও সন্দেহ করতে পারা যায় না যে শিক্ষায় অনুঙ্গ (Association) ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু শিশুর শিক্ষা যে মূলত কতকগুলি সসাপেক্ষ প্রতিবর্তের প্রতিষ্ঠা এবং অভ্যাস রুপ স্থায়ী সাপেক্ষ প্রতিবর্ত গঠন তা সাম্প্রতিক মনোবিদ্যার একটি আবিস্কার সত্য। একটি মেধাবী শিক্ষার্থী সহজে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত করতে পারে কিন্তু অপেক্ষাকৃত ভাবে নিরেট শিক্ষার্থী পারে না। তাছাড়া শিক্ষা যে শিক্ষকের আয়ত্তাধীন সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ সেদিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরায়। এই মতবাদ অনুযায়ী ইচ্চানুরুপ শিক্ষা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে আশানুরুপ শিক্ষাফল লাভ করো যায়। আমরা যতই Pavlov প্রতিবর্ত সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ যা Watson,Lashley প্রমুখ চেষ্টিতবাদীদের দ্বারা গৃহীত ও সমর্থিত তার গুণাগান করি না কেন এ কথা ঠিক যে সকল উদ্দীপকই সাপেক্ষ হতে পারেনা। এমন কতকগুলো উদ্দীপক আছে যা অন্য উদ্দীপকের পরিবর্তে কাজ করতে পারে না। যেমন মায়ের ওপর শিশুর স্বাভাবিক টান বা আকর্ষণ থাকে কিন্তু মায়ের সঙ্গে যাকে দেখে শিশু তাকে ততটা ভালোবাসতে শেখে না।

সাপেক্ষীকরণের মূর্ত অভিব্যক্তি আমরা দেখতে পাই Pavlov প্রবর্তিত মতবাদে। লালা নিঃসরণরুপ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে ঘন্টাধ্বনিরুপ একটা কৃত্রিম বা অপ্রাসঙ্গিক উদ্দীপকের সংযোগ স্থাপনের জন্য Pavlov ঘন্টাধ্বনিকে মূল উদ্দীপক খাদ্যের সহিত একসঙ্গে উপস্থাপন করলেন। কুকুরকে খাদ্য দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অথবা অব্যহিত পূর্বে ঘন্টাধ্বনি করা হল এবং দেখা গেল যে খাদ্য না দিলে ও শুধু ঘন্টাধ্বনি শুনেই কুকুরের জিহ্বা লালা সিক্ত হচ্ছে। অর্থাৎ কুকুরটা একটা নতুন প্রতিক্রিয়া শিখেছে। এই নতুন প্রতিক্রিয়াকে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলেছেন। খাদ্য হল স্বাভাবিক উদ্দীপক লালানিঃসরণ হল স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এবং ঘন্টাধ্বনি সাপেক্ষ বা বিকল্প উদ্দীপক যদি কয়েকবার শুধু ঘন্টাধ্বনি করা হয় কিন্তু খাদ্য না দেওয়া হয় তবে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়াটি অর্থাৎ জিহ্বা থেকে লালা নিঃসরণের ব্যাপারটা আর হবে না। কিন্তু এটি চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় না। আবার যদি কয়েকবার ঘন্টাধ্বনির সঙ্গে খাদ্য দেওয়া হয় তাহলে লালানিঃসরণ প্রতিক্রিয়াটি পুঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। বিকল্প একটা উদ্দীপককে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া করার ব্যাপারকে সদর্থক সাপেক্ষীকরণ এবং বিকল্প উদ্দীপককে অগ্রাহ্য করে কোনো প্রতিক্রিয়া না করার ব্যাপারকে নঞর্থক সাপেক্ষীকরণ বলে।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে শিকনের ক্ষেত্রে সাপেক্ষীকরণ প্রক্রিয়া বেশ হয় গুরুত্বপূর্ণ Pavlov এর মতে সাপেক্ষী করণ ও অনাপেক্ষীকরণ (Conditioning deconditioning) এর দ্বারাই সকল প্রকার শিখন নিষ্পন্ন হয়। শিক্ষক মহাশয় শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করা মাত্রই শিশু ছাত্রকে উঠে দাঁড়াতে হয়। শিখন প্রসঙ্গে এরুপ সাপেক্ষীকরণ একান্তই আবশ্যিক। আবার

টিপ্পনী

অনাপেক্ষীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে শিশুর কুঅভ্যাসগুলো বর্জন করতে শিক্ষা দেওয়া হয়। Pavlov এর মতে অনুশীলন শিক্ষা ও নিয়মানুবর্তিতার ফলে আমরা যে বিভিন্ন প্রকার অভ্যাস অর্জন করে তারা সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার ক্রমিক শৃঙ্খল ছাড়া অন্য কিছু নয়।

■ Thorndike প্রবর্তিত সংযোগবাদ (Thorndike's Connectionism)

টিপ্পনী

Thorndike এর সংযোগবাদ বা যোগসূত্র স্থাপন মতবাদ Connectionism নিম্নশ্রেণির প্রাণীর ওপর পরিচালিত দীর্ঘ গবেষণার ফল। Thorndike বলেন শিখন বলতে বোঝায় উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন। এটা একটা যান্ত্রিক ক্রিয়া যাতে একবার ভুলকরে আবার ভুল সংশোধন করে অগ্রসর হতে হয়। তিনি দেখাবার চেষ্টা করলেন যে শিখন বুদ্ধি বা বিচারগত এটি যান্ত্রিক এবং অন্ধ Thorndike এর মতবাদকে যোগসূত্র স্থাপনের মতবাদ (Connectionism, thebound theroy of learning) ও বলাহয়। উদ্দীপক বলাই বাহুল্য যা আমাদের মনের মধ্যে সংবেদনের সৃষ্টি করে এই সংবেদন একটা নিছক চেতনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই উদ্দীপকের প্রত্যুত্তরে আমাদের যে সাড়া বা প্রতিক্রিয়া এ দুটোর মধ্যে যখন নির্ভুল যোগসূত্র স্থাপিত হয় তখনই শিকন সম্ভব হয়। আর যখন উদ্দীপকের সঙ্গে উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া সংযোগ ঘটবে না ততক্ষণ শিখনও হবে না। এই জন্য Thorndike মনে করেন শিখন হল উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নির্ভুল সংযোগ (S →R Bond)।

তিনি শিখন সম্বন্ধীয় যে মতবাদটি খাড়া করলেন সেটি যে অনুষঙ্গবাদ (Associationsim) এর ওপর প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই অনুষঙ্গবাদের মূল কথা হল আমাদের প্রত্যেক মানসিক প্রক্রিয়াই বিভিন্ন মানসিক এককের সংযোগ থেকে সৃষ্টি হয়। Thorndike তাঁর মতবাদ সম্বন্ধে আমাদের সামনে যা উপস্থাপিত করছেন তা থেকে পরিস্কার বোঝাযায় যে শিখনও এক ধরনের মানসিক এককের সংযোগ।

তিনি শিখনকে যে ভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন তার ওপর ভিত্তি করে Thorndike তাঁর মতবাদের নাম দিলেন প্রচেষ্টা ও ভুল Trial and error এর পদ্ধতি। তিনি দেখাবার চেষ্টা করলেন যে বারবার চেষ্টা ও ভুল করতে করতে প্রাণী শেখে। অনেক ভুল ভ্রান্তি ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নির্ভুল প্রতিক্রিয়াটাকে প্রাণীকে খুঁজে বার করতেহয়। চেষ্টা করতে করতে এবং ভুল করতে করতে যখনই কেউ নির্ভুল প্রতিক্রিয়াটি খুঁজে বার করতে পারবে তখনই তার শিখন সম্ভব হবে। Thorndike একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালকে খাঁচায় রাখেন এবং খাঁচার বাইরে তার প্রিয় খাদ্য মাছ এমন ভাবে রেখে দেন যা খাঁচা থেকে বিড়ালটি প্রথমে খাঁচার ফাঁক দিয়ে মাছটি ধরবার চেষ্টা করে কিন্তু বিফল হয়। তারপর খাঁচা থেকে বার হওয়ার জন্য ছোটা ছুটি দাপাদাপি কামড়ানো ধাক্কা ইত্যাদি শুরু করল। হঠাৎ থাবা দিয়ে নাড়াচাড়া করার ফলে ছিট কিনিটি সরে গেল বিড়াল খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসে মাছটা খেয়ে নিল। আবার তাকে খাঁচার মধ্যে রাখা হল সে আবার একই ভুল করল। সবশেষ পরীক্ষায় (চব্বিশ ক্রমিক পরীক্ষা) বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে দরজা খুলে মাছটি খেয়ে নিল। বিড়ালের লক্ষ্যে পৌঁছোবার সময় অনিয়মিতভাবে ক্রমশ কমতে থাকে। বিড়ালের ভুল বিচলন গুলো ক্রমশ মুছে গিয়ে শুদ্ধ বিচলনগুলো থেকে। এই ভাবে দেখা গেল যে বিড়ালটির শিখন বুদ্ধি বিচারগত নয় বারবার চেষ্টা ও ভুলের দ্বারা সে

শিক্ষালাভ করেছে। নিম্নলিখিত লেখ বা চিত্রের মাধ্যমে Thorndike পরিচালিত পরীক্ষাফল দেখানো যেতে পারেঃ

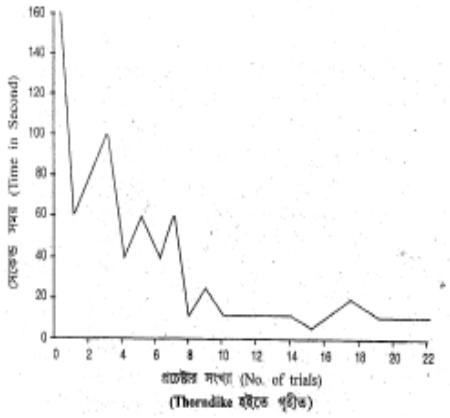

Thorndike হইতে গৃহীত

Thorndike মনে করেন যে এই পরীক্ষণ মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মানুষও বারবার চেষ্টা ও ভুলের দ্বারা শেখে। যে শিশু কোনো লোককে দেখলে আগে পালিয়ে যেত সে যদি এখন তাকে দেখলেই হাসে এবং কোলে যেতে চায় তাহলে বুঝতে হবে যে ওই লোকের সঙ্গে তার ভয় পাওয়ার আচরণের সংযোগ ভেঙে গেছে এবং নতুন সংযোগ স্থাপিত হচ্ছে। ক্ষুধার্ত শিশু যখন কাঁদে তখন মার দৃষ্টি কান্নার ফলে শিশুর ওপর গিয়ে পড়ে। এর ফলে শিশুর নিকট বিরক্তিকর কিছু হলেই শিশু কান্না শুরু করে দেয়। এখানে কান্নার সঙ্গে সুখকর অবস্থার যোগসূত্র স্থাপিত হচ্ছে। যে অবস্থাটি কান্নার ফলে দেখা দিচ্ছে অর্থাৎ মায়ের মনোযোগ সেরুপ কোনো সাড়া যদি অস্বস্তিজনক পরিস্থিতির উদ্ভব করে তাহলে যোগসূত্রটি ছিন্ন হয়ে যাবে।

শিখতে গেলে যে চেষ্টা করতে হয় তাতে সন্দেহ নেই আবার প্রথম চেষ্টাতেই যে শিখন সম্ভব হবে তারও নিশ্চয়তা নেই। ফলে দরকার কী? বারবার চেষ্টার ফলে শিখন সম্ভব। বারবার চেষ্টার একটাই সার্থকতা যে পরবর্তী চেষ্টায় পূর্ববর্তী চেষ্টার ভুল দূর করতে পারা যায়। এককথায় বলতে গেলে সব ভুলগুলো সংশোধিত হয়ে শিখন ঘটে।

শিখন সম্বন্ধীয় Thorndike এর মতবাদ নিশ্চই বহু পরীক্ষণ এবং প্রয়োগের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে তাঁর চিন্তাধারার প্রয়োগিক মূল্য বা গুণ অপরিসীম। কিন্তু তবুও তাঁর চিন্তাধারা বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে এবং সাথে সাথে সমালোচিতও হয়েছে। খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ বিড়াল তার প্রিয় খাদ্য মাছ না পাওয়া পর্যন্ত আন্তরিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে গেছে। অতএব তার প্রচেষ্টা ছিক অন্ধ নয়। বিড়ালের প্রচেষ্টার মধ্যে একাগ্রতা বা দৃঢ়তা নিশ্চয়ই ছিল। তা না হলে বিড়াল কী ভাবে ভুল ও প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে অভীষ্টে পৌঁছোল? মজার ব্যাপার হল Thorndike এসব আদৌ স্বীকার করেন না। প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমেই কেবল প্রাণীরা শেখে এ কথা গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বলেছেন প্রাণী যা কিছু শেখে তা হয় সাফর্ল নয় ব্যর্থতা ধরনের আচরণের দ্বারা শেখে। এ কথা যে ঠিক নয় তা বিভিন্ন মনোবিদ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। প্রাণী বিভিন্ন উদ্দীপকের পার্থক্য বুঝতে পারে এবং বাস্তব অবস্তার বিভিন্ন অংশে পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝার ক্ষমতা প্রাণীর আছে তা প্রতিষ্ঠিত ও হয়েছে। তাছাড়া

টিপ্পনী

বিড়ালের ভুল ভ্রান্তির ওপর একটু বেশি পরিমাণে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বিড়ালের আচরণে যে সব মূর্খের মতো ভুল লক্ষ করেছেন তা আমাদের কাছে সহজ মনে হলেও বিড়ালের কাছে বেশ কঠিন। কাজেই বিড়ালের আচরণে এত ভুল হয়েছে। হলেও বিড়ালের কাছে বেশ কঠিন। কাজেই বিড়ালের আচরণে এত ভুল হয়েছে। Thorndike মনে করতেন দ্রুত শিখন তখনই সম্ভব যখন কাজটা খুব সহজ খুব স্পষ্ট ও খুব পরিস্কার ভাবে সুনির্দিষ্ট। ("Very simple,very obvious and very clearly defined") কিন্তু তাঁর মতে সমস্যা যখন জটিল তখন প্রাণীর আচরণ তিনি মনে করেন নিছক মূর্খামির নামান্তর।

টিপ্পনী

Thorndike প্রবর্তিত সংযোগবাদের মূল বক্তব্য বিষয় কী এবং তা সম্পূর্ণ রুপে গ্রহণীয় কি না তা আমরা দেখলাম। আমাদের এই দেখা কিছুতেই সম্পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত তাঁর উদ্ভাবিত আটটি সূত্র (Law) এর সঙ্গে আমরা পরিচিত হচ্ছি। এই আটটি সূত্রের মধ্যে তিনটি মুখ্য সূত্র (Major Law) এবং পাঁচটি গৌণ সূত্র (Major Law) । তিনটি মুখ্য সূত্রহল ১ প্রস্তুতির সূত্র (Law of readiness) ২ অনুশীলনের সূত্র (Law of exercise) এবং ৩ ফললাভের সূত্র (Law of effect)।

১. প্রস্তুতির সূত্র (Law of readiness)

যখন একটি সংযোগ সূত্র কাজ করবার জন্য প্রস্তুত থাকে তখন কাজ করতে পারলে সুখ হয় এবং সংযোগ সূত্র যদি প্রস্তুত না থাকে তখন বিরক্তির সৃষ্টি হয়। এখানে প্রস্তুতি বলতে Thorndike স্নায়ুতন্ত্রের প্রস্তুতিকে বুজিয়েছেন। উদ্দীপক স্নায়ুতন্ত্রের ওপর প্রভাব বিস্তার করলে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় তা বহন করে নিয়ে যায়। neurone সবসময় উদ্দীপনাকে বহন করবার জন্য প্রস্তুত থাকে না। যখন প্রস্তুত থাকে তখন বহন করা সুখকর এবং বহন করতে না পারলেই বিরক্তিকর।

২. অনুশীলনের সূত্র (Law of exercise)

এই সূত্র অনুযায়ী কোনো উদ্দীপক ও আচরণের মধ্যে সংযোগ ঘটে এবং অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে তাহলে সংযোগটি দৃঢ়তর হয়। পক্ষান্তরে যদি বহুদিন সংযোগ উদ্দীপক ও আচরণের মধ্যে না থাকে তাহলে সংযোগ শিথিল হয়ে যায়। সহজ ভাবে বলতে গেলে একটা আচরণ বারবার অনুশীলন করলে উক্ত পরিস্থিতির সঙ্গে আচরটির সংযোগ দৃঢ় হয়। আচরণটির পুনরাবৃত্তি না হলে সেই আচরণ দৃঢ় হতে পারে না।

৩. ফললাভের সূত্র (Law of effect)

এই সূত্র অনুযায়ী কোনো উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়া মধ্যে যদি পরিবর্তনযোগ্য সংযোগ স্থাপিত হয় এবং এরুপ সংযোগের ফল যদি সুখকর হয় তাহলে সংযোগটির দৃঢ়তা বৃদ্ধি হয়। পক্ষান্তরে যদি উক্ত সংযোগ বিরক্তিকর হয় তাহলে সংযোগটির দৃঢ়তা কমে যায়। এই সূত্রটিকে আরও সহজভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে সফল প্রতিক্রিয়া জীবের কাচে সুখকর অসফল প্রতিক্রিয়া বিরক্তিকর। যে প্রতিক্রিয়া সুখকর তা দৃঢ় হয় বিরক্তিকর প্রতিক্রিয়াগুলো অবলুপ্ত হয়ে যায়।

এই তিনটি মুখ্য সূত্রের সঙ্গে Thorndike আরও পাঁচটি গৌণসূত্র যুক্ত করেছিলেনঃ

৪. একই উদ্দীপকের বহু সাড়ার সূত্র (Law of multiple response ot the same

externalstimulus) ৫ মানসিক অবস্থার সূত্র (Law of attitude) ৬ আংশিক প্রতিক্রিার সূত্র ৭ সদৃশীকরণ বা উপমানের সূত্র (Law of assimilation or analogy) ।৮ অনুসঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্র (Law of associative shifting)

এই পাঁচটি গৌণসূত্র অনুশীলন এবং ফললাভ সূত্রের অধীন।

শিখন সম্বন্ধীয় Thorndike প্রবর্তিত প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন মতবাদ এবং তৎসম্বন্ধীয় শিখন সূত্রগুলো শিক্ষামনোবিদ্যার ক্ষেত্রে কতখানি প্রাসঙ্গিক? এই প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক শিক্ষক উপস্থিত রয়েছেন শ্রেণিকক্ষে যেখানে একাধিক ছাত্র তাঁর সামনে বসে রয়েছে প্রশংসা নিশ্চিতভাবে সুখদায়ক নিন্দা বিপরীতক্রমে বিরক্তিকর। শিক্ষণ শ্রেণীকক্ষে পাঠদানে প্রশংসা এবং নিন্দা এই দুটোকেই ব্যবহার করে আসেন।শিক্ষকের এই দুটি ব্যবহারের ব্যাপারে সাবধানী হওয়া দরকার।তিনি কি সবসময় ছাত্রদের প্রশংসা করবেন বা নিন্দা করবেন ছাত্রদের শিক্ষকের দ্বারা প্রেষিত হতে হবে যাতে তারা শিক্ষকের কাছ থেকে প্রশংসা অর্জন করতে পারে এবং নিন্দা পরিহার করে চলতে পারে। এই খানে শিক্ষা মনেবিদ্যার ক্ষেত্রে আমরা ফল লাভের সূত্রের প্রয়োগ দেখতে পাই। উদাহরণ স্বরুপ একটা নির্দিষ্ট অঙ্ক করতে গিয়ে ছাত্রে কতকগুলো ভুল পদক্ষেপ নিয়ে ফেলল যেটা তার মনে বিরক্তি সৃষ্টি করল কিন্তু যদি সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারত তা হলে সুখ স্বাভাবিক ভাবে মনের মধ্যে দেখা দিত।

স্বভাবতই ছাত্র খুব সাবধনী হয় যাতে সঠিক পদক্ষেপ গুলো থেকে যায় (Stanoed in) এবং ভুল পদক্ষেপ গুলো মুছে যায় (Stamped out)। শিক্ষক ছাত্রকে বাড়িতে কিছু কাজ দিয়ে থাকেন এবং সেই কাজকে তিনি শাস্তি এবং বিরক্তির সঙ্গে অনেক সময় একত্রিত করে ফেলেন। কিন্তু শিক্ষক যদি নিজেকে জিজ্ঞেস করেন আমি ছাত্রকে এর দ্বারা কি উৎসাহ দিচ্ছি কি বন্ধন আমি সুদৃঢ় করছি অথবা দুর্বল করছি এই বিশেষ ধরনের আচরণের দ্বারা তাহলে যত সুখী শিশু আজকের পৃথিবীর রয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি সুকী শিশু দেখতে পাওয়া যাবে। মূল কথা হল শিক্ষকের আচরণে মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব কী সেটা শিক্ষকের ভাবা দরকার।এবং যদি তিনি দেখেন তাঁর অনুসৃত আচরণ কাঙ্ক্ষিত ফল দিচ্ছে তাহলে ভালো এবং যে কোনো ভাবেই হোক তা শিক্ষকের অনুসরণ করাউচিত।

অনুশীলনের সূত্র এবং ফললাভের সূত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করে চলে।যা করতে শিক্ষার্থী সফল হয় তা স্বাভাবিক ভাবেই অনুশীলন করে। কারণ সেটা করে সে তৃপ্তি পায়। যা সুখকর তা স্মরণযোগ্য যা বিরক্তিকর তা বিস্মৃতির যোগ্য। অতৃপ্তিকর শিখন মোটেই স্থায়ী হয় না। তৃপ্তিকর শিখনের পিছু ধাওয়া করে শিক্ষার্থী। শিক্ষকের লক্ষ রাখা দরকার কোন পদ্ধতিতে তার শিক্ষাদান শিক্ষার্থীর কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে। অতিদীর্ঘ শিক্ষনীয় বিষয়কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে নিয়ে শিক্ষার্থীর কাছে এমন ভাবে তুলে ধরতে হবে যাতে সে মনে না করে যে শিক্ষণীয় বিষয় তার কাছে বোঝা। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে শিক্ষার্থীর শেখার ইচ্ছা থাকা জরুরি যদি সেই তাগিদ শিক্ষার্থীর মধ্যে থাকে তাহলে সে তাড়া তাড়ি অগ্রসর হতে পারবে। নিস্ক্রিয় ভাবে বসে থাকলে শিক্ষার্থীর চলবে না Thorndike আবিস্কৃত সূত্রগুলোর বহুবিধ সমালোচনা রয়েছে তা সত্ত্বেও সূত্র গুলোর শিক্ষাতত্ত্বের উপর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। দক্ষতা অর্জনের সহায়ক হিসেবে অনুশীলনের সূত্রকে অস্বীকার করা চলে না।বিদ্যালয় শিক্ষার ব্যাপারেও অনুশীলনের সূত্র যথেষ্ট সহায়ক। একটা কবিতা মুখস্থ করতে হলে তা বারংবার আবৃত্তি করতে

টিপ্পনী

হয়।

যে আচরণ প্রশংসিত কিংবা পুরস্কৃত হয় তা আমরা বারংবার করি এবং বারে বারে করার ফলে ওই প্রশংসিত আচরণ সুনিদিষ্ট হয়। বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রীদিগকে তাদের কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার মানপত্র পদক ইত্যাদি দেয়।

টিপ্পনী

গতানুগতিক এবং একঘেয়ে প্রতিক্রিয়া ওপর নির্ভর না করে শিক্ষার্থী যাতে নতুন প্রতিক্রিয়া আবিস্কার করতে পারে সে জন্য তাকে যথাযথ নির্দেশ দিতে হবে। শিক্ষার্থী যখন একটা শিক্ষণ পরিস্থিতির মধ্যে চলাফেরা করে তখন সেই পরিস্থিতির ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে সে সম্বন্ধে তাকে অবহিত হতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা দরকার এবং সেটা যদি সম্ভব হয় তাহলে শিখন কার্য অল্পায়াসে সম্পন্ন হয়।

Thorndike মনে করেছিলেন যে সাফল্য যেমন সংযোগ সূত্রকে দৃঢ় করে অসাফল্য সংযোগ সূত্রকে অনুরুপভাবে শিথিল করতে পারেনা কাজেই তাঁর প্রবর্তিত ফললাভের সূত্রকে পুরস্কার ও শাস্তির সূত্র (Law of reward and punishment) ও বলা যায়। শিশুকে পুরস্কার দিলে সে তাড়াতাড়ি শেখে কিন্তু শাস্তি দিয়ে তার ভুল ভ্রান্তি অত তাড়া তাড়ি শোধরানো যায় না।

Thorndike প্রবর্তিত সূত্রগুলো শিখনের ক্ষেত্রে কতখানি প্রাসঙ্গিক তা আমরা দেখলাম। সব ভুল সংশোধিত হয়ে শিখন ঘটে। Thorndike এর মতবাদের এই নির্যাসটুকু আমরা উপলব্ধি করেছি। ব্যাবহারিক জীবনে একটা অতি সাধারণ কথা একবার না পারিলে দেখ শতবার। মানুষের ক্ষেত্রে যেমন সত্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে ও তেমনি সত্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় Thorndike তাঁর সংযোগবাদকে যে ভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে এটা সম্পূর্ণ ভাবে যান্ত্রিক। শিক্ষায় যেন উদ্দেশ্যমূলক ভাবে কোনো স্থানই নেই। কিন্তু ***Mc Dougall, Woodworth*** এবং ***Morgan*** প্রমুখ মনোবিজ্ঞানী মনে করেন প্রস্তুতি একাগ্রতা বা দৃঢ়তার স্থান রয়েছে শিখনের ক্ষেত্রে। সুখ দুঃখ বেদনা প্রভৃতি মানস বৃত্তির সঙ্গে প্রচেষ্টা সংশিষ্ট। অথচ Thorndike বলতে চাইছেন যে শিক্ষায় এই সকল উচ্চতর মানস বৃত্তির যেন কোনো স্থানই নেই।

একথা অবশ্য স্বীকার্য যে প্রচেষ্টা ও ভুল করতে করতে ধীরে ধীরে ভুল কমে যায়। কিন্তু প্রশ্ন হল ভুল গুলো কি আপনি আপনি শোধরায়? সম্ভবত না। প্রাণীর দৈহিক মানসিক অবস্থার ওপর চেষ্টা ও ভুলের ফলাফল অনেকটা নির্ভর করে। Thorndike প্রবর্তিত প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন মতবাদকে ***Woodworth*** নিম্নলিখিত ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

ক) একটা লক্ষ্যের প্রতি প্রাণীর প্রস্তুতি নিবন্ধ থাকে।

খ) সেই লক্ষ্যের কোনো সোজাসুজি পথ থাকে না।

গ) এলোপাথাড়ি প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরিস্থিতিকে আবিস্কার করতে হবে।

ঘ) হঠাৎ লক্ষ্যে পৌঁছোবার সন্ধান পাওয়া যায়।

ঙ) যে সমস্ত ইঙ্গিত পাওয়া যায় সেগুলোর মধ্যে কিছুকে চেষ্টা করে দেখতে হয়।

চ) এই ভাবে চেষ্টা করতে করতে শেষ পর্যন্ত প্রাণী লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে।

Thorndike এর মতবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যায় যে শিখন সম্বন্ধীয় যে সমস্ত সূত্র উপস্থাপনা করেছেন তারাই বলে দিচ্ছে যে শিখনের একটা মৌল সমস্যা হল আমরা কেন কিছু প্রতিক্রিয়াকে ধরে রাখতে পারি আবার অন্য প্রতিক্রিয়াকে ধরে রাখতে পারি না।

Thorndike সংযোগ সূত্র এর ওপর বড়ো বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন ।কিন্তু এই সংযোগ যদি নিউরোনসমূহের সংযোগ মাত্র হয় তাহলে এটা খুব স্পষ্ট নয়। প্রস্তুতির সূত্রকে মানসিক প্রস্তুতি হিসেবে গ্রহণ না করলে সূত্রটির কোনো অর্থই হয় না।

টিপ্পনী

অনুশীলনের সূত্রটি যান্ত্রিকতা দোষে দুষ্ট। শুধু অনুশীলনের যে কোনো মূল্য নেই এবং তার ফলে কোনো খিছু যে শেখা যায় না তার দৃষ্টান্ত বিদ্যালয়ের সাক্ষ্য থেকে পাওয়া যেতে পারে।

অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই যে দুঃখা নুভূতি সব সময়ই আচরণের বিলোপ ঘটায় একথা বলা যায় না। বহু বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিন মনের মধ্যে বাসা বেঁধে থাকে। এ থেকে আমরা একটা অনুসিদ্ধান্তেই যেতে পারি যে শিখন এবং সুখ দুঃখের অনুভূতির মধ্যে কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। Thorndike নিজে তাঁর প্রণীত শিখন সম্বন্ধীয় সূত্রগুলোর অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই ঘাটতি দূর করবার জন্য পরবর্তী কালে অন্তভুক্তি Belongingnes র ধারণা প্রবর্তন করেন। অন্তভুক্তি বলতে আমরা সমগ্র অংশের সম্বন্ধে জ্ঞান বোঝাই। এই সম্বন্ধের জ্ঞান যে যত তাড়া তাড়ি ধরতে পারে সে তত তাড়া তাড়ি শেখে।

Thorndike যে তিনটি মৌলিক সূত্র প্রণয়ন করেছিলেন তার মধ্যে অনুশীলনের রীতি শিখনের ক্ষেত্রে একটা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।এর অনেক উদাহরণ আমরা দিতে পারি। যেমন স্কেট শিখতে গিয়ে অথবা গাড়ি চালানো শিখতে গিয়ে অথবা টাইপরাইটার যন্ত্র চালাতে গিয়ে প্রথমেই যেটা প্রয়োজনীয়

সেটা হল সঠিক বিচরণ সঠিক পারম্পর্য এ আনতে হবে। যতক্ষণ না ঠিক মতো সেই বিচরণ গুলো আয়ত্তাধীন হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলোকে বারবার অনুশীলন করেযেতে হবে। এটা শাব্দিক শিখন Verbal Learning এর ক্ষেত্রে ও প্রযোজ্য ।ফরাসি শব্দকোষ আয়ত্ত করতে গেলে কিংবা কোনো কবিতা আয়ত্ত করতে গেলে বা গাণিতিক সূত্র আয়ত্ত করতে গেলে বারবার অনুশীলনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অনুশীলন সূত্রের এত জয়গান করলেও এরও ত্রুটি বিচ্যুতি আছে। এ প্রসঙ্গে একটা বালক সম্বন্ধে একটা গল্প চালু আছে। একটি বালকের এমন একটা বদ অভ্যাস আছে যে আমি যে আমি চলে গেছি এটা লিখতে গিয়ে সে বারবার লিখছে তার এই বদ অভ্যাসটা সংশোধন করার জন্য তার শিক্ষক তাকে বিদ্যালয়ের ছুটির পর থাকতে বলেন এবং তাকে লিখতে বলেন এবং এটা তাকে একশো বার লেখানো হল। কাজটা শেষ করবার পর শিক্ষককে চলেযেতে দেখে সে লিখে স্থান ত্যাগ করল এই ভাবে আমি লিখেছি আমি চলে গেছি ("I have written, I hame gone") এবং বলাই বাহুল্য একশো বার। এবং যেহেতু আপনি নেই আমি বাড়ি চলে গেছি ("Since you are not here, I have went home") ছেলেটি স্পষ্টতই কোনো আন্তসম্পর্ক দেখছে না আমি চলে গেছি তাই বিরক্তিকর কাঝ এবং বলা আমি চলে গেছি । যার ফলে কিছু না বুঝেই এই ধরনের অনুশীলন তার কাছে কোনো মূল্যই বহন করেনি। ছাত্ররা বিদ্যালয়ের কাজে যদি উৎসাহিত বোধ না করে কিছুতেই তারা শিখতে চায় না। ছাত্রে বিদ্যালয়ের পঠিতব্য বিভিন্ন বিষয় যেমন গণিত এবং ইতিহাস এবং প্রাত্যহিক জীবনে রাজনৈতিক অবস্থা ও ব্যাবসা বাণিজ্যের মধ্যে যখন কোনো আন্তঃসম্পর্ক দেখতে পায় না তখন

তারা সেই সব বিষয় শেখার জন্য কোনো রকম উৎসাহ দেখায় না। অতএব তাঁর সংযোগ বাদে যতই সোচ্চারে বলুন নাকেন যে উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ যার এপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা মনোবৈজ্ঞানিক আণবিকতা (Psychological atomism) বলে অভিহিত করেছেন গেস্টাল্টবাদী মনোবিজ্ঞানীরা। শিখনের সমগ্র পরিস্থিতিকে একটা এক করুপে গ্রহণ করা হয়। সেই জন্য তাঁদের পুরোধা *Koffa* মনে করেন যে শিখন হল পরিবেশ বা পরিস্থিতির পুনগঠন (Learning is reorganisation of the situation) । গেস্টাল্টবাদ যতই এর সংযোগবাদকে নস্যাৎ করুক না কেন শিক্ষণের ক্ষেত্রে এই মতবাদ যে শেষ কথা তা স্বীকার করা যায় না। শিক্ষককে সব সময় মনে রাখতে হবে যে পরিস্থিতিতে তিনি শিক্ষাদান করছেন তা হল শ্রেণীকক্ষ যেখানে বহু ছাত্র ছাত্রী তাঁর সামনে বসে রয়েছে। Thorndike প্রণোদিত সূত্র গুলোর মধ্যে আমরা ফল লাভের সূত্র এর সম্মুখীন হয়ে থাকি। ফল সংকান্ত নিয়মকে পুরস্কার ওদন্ড সংকান্ত নিয়মও বলা যায়। প্রশংসা নিশ্চয়ই তৃপ্তিদায়ক অপরপক্ষে দোযারোপ বিরক্তিকর। এই প্রশংসা এবং দোযারোপ বহুল পরিমাণে শিক্ষাদ পদ্ধতির মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু একথাও শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে প্রশংসা এই নিন্দা করার আগে তাকে অত্যন্ত সাবধানা হতে হবে। শিক্ষক কি সবসময় ছাত্রকে প্রশংসা করবে নাকি নিন্দা করবেন? প্রশংসা অর্জন এবং নিন্দা বিসর্জনের জন্য ছাত্রকে প্রেষিত হতে হবে।

টিপ্পনী

থর্নডাইকের সংযোজনবাদ

থর্নডাইকের মতে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপনই হল শিখন। যা কিছু আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি জাগাতে পারে তাই হল উদ্দীপক। আর কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়ানুভূতির উত্তরে আমরা যে সাড়া দিই তাই হল প্রতিক্রিয়া। থর্নডাইকের ব্যাখ্যায় এই উদ্দীপকের আবেদন এবং তার উত্তরে দেওয়া সাড়া বা প্রতিক্রিয়া–এই দুটির মধ্যে যখন নির্ভুল যোগসূত্র স্থাপিত হয় তখনই শিখন হয়। যেমন, মনে কার যাক, আমার সামনে একটি বোর্ডে ৪ টি সুইচ আছে। আর আছে একটা আলো। বলা হল যে ঐ চারটি সুইচের মধ্যে বিশেষ একটি সুইচ টিপলে আলো জ্বলে উঠবে। আমি প্রথম সুইচটি টিপলাম আলো জ্বললো না। দ্বিতীয়টি টিপলাম, তখনও জ্বললো না। কিন্তু যেই তৃতীয়টি টিপলাম আলোটি জ্বলে উঠল। এবার আমি জানলাম তৃতীয় সুইচটি টিপলে আলোটি জ্বলে। অর্থাৎ আমি শিখলাম কিভাবে আলোটি জ্বালাতে হয়। এটি একটি শিখনের সরলতম দৃষ্টান্ত। এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শিখন হল না, কেননা সেখানে উদ্দীপকের (আলো) সঙ্গে নির্ভূল প্রতিক্রিয়ার (তৃতীয় সুইচটি টেপার) সংযোজন হয়নি। কিন্তু তৃতীয়বারে উদ্দীপক ও তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নির্ভূল সংযোজন হয়েছে এবং সেইজন্য সে ক্ষেত্রে শিখনও সম্ভব হয়েছে।

উপরের উদাহরণটি শিখনের সরলতম ক্ষেত্র। একটি অপেক্ষাকৃত জটিল উদাহরণ নেওয়া যাক। মনে করা যাক একটি ছেলেকে একটি বীজগণিতের অঙ্ক কষতে দেওয়া হয়েছে। অঙ্কটি বিশেষ একটি ফরমূলা প্রয়োগ করে করা যায়। ছাত্রটি তার জানা ফরমূলাগুলির একটির পর একটির প্রয়োগ করতে করতে ঠিক ফরমূলাটি প্রয়োগ করতেই অঙ্কটি হয়ে গেল। যতক্ষণ সে ঠিক ফরমূলাটি প্রয়োগ করেনি ততক্ষণ তার উদ্দীপক (অঙ্কটি) ও প্রতিক্রিয়ার (ঠিক ফরমূলাটির প্রয়োগ) মধ্যে নির্ভূল সংযোজন হয়নি। আর যেই সে নির্ভূল ফরমূলাটি প্রয়োগ করতে পারল সঙ্গে সঙ্গে উদ্দীপক–প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোজনও নির্ভূল হল এবং তার শিখনও ঘটলো।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে যখনই উদ্দীপকের সঙ্গে ঠিক তার উপযোগী প্রতিক্রিয়াটি সংযুক্ত হবে তখনই শিখন ঘটবে। আর যতক্ষণ উদ্দীপকের সঙ্গে উপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার সংযোগ ঘটবে না ততক্ষণ শিখনও ঘটবে না। এইজন্যই থর্নডাইকের মতে শিখন হল উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নির্ভূল সংযোগ-স্থাপন ছাড়া আর কিছু নয়।

এই উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোগের মধ্যেমে শিখনের যে তত্ত্বটি থর্নডাইক দিলেন সেটি যে অনুষঙ্গবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অনুষঙ্গবাদের মৌলিক নীতিটি হল যে আমাদের প্রত্যেক মানসিক প্রক্রিয়াই প্রত্যক্ষণ, সংবেদন, প্রতিরূপ প্রভৃতি বিভিন্ন মানসিক এককের সংযোগ থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। থর্নডাইকের সংযোজনবাদে শিখনও এই ধরনের মানসিক এককের সংযোগ থেকে সৃষ্টি হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়।

টিপ্পনী

উপরের বর্ণিত শিখনের সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করেই থর্নডাইক তাঁর শিখন ও পদ্ধতির নাম দিলেন 'প্রচেষ্টা-ও-ভুলের' পদ্ধতি। অর্থাৎ প্রাণী শেখে বার বার চেষ্টা ও ভুল করতে করতে। কোন কিছু শিখতে হলে উদ্দীপকের উপযোগী নির্ভূল প্রতিক্রিয়াটি অনেকগুলি ভুল প্রতিক্রিয়ার মধ্যে থেকে প্রাণীকে খুঁজে বার করতে হয়। যেমন, সুইচ টিপে আলো জ্বালার বেলায় একটির পর একটি সুইচ টিপে দেখতে হয়েছে কোন্ সুইচটিতে আলো জ্বলে বা অঙ্ক কষার ক্ষেত্রে ছেলেটিকে পর পর বিভিন্ন ফরমূলা প্রয়োগ করে কোন্ ফরমূলাটি প্রয়োগ করলে অঙ্কটি ঠিক হয় তা খুঁজে বার করতে হয়েছে। যথার্থ নির্ভূল প্রতিক্রিয়া সংখ্যায় একটি, অথচ ভুল প্রতিক্রিয়া সংখ্যায় অগণিত। এই অগণিত ভুল প্রতিক্রিয়ার মধ্যে থেকে যেটি নির্ভূল প্রতিক্রিয়া সেটিকে খুঁজে বার করতে হলে বার বার তাকে চেষ্টা করতে হবে এবং তার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই সে বার বার ভুল করবে। এইভাবে চেষ্টা করতে করতে এবং ভুল করতে করতে যখনই সে নির্ভূল প্রতিক্রিয়াটি খুঁজে বার করতে পারবে তখনই তার শিখন সম্ভব হবে। সেইজন্য থর্নডাইকের মতে সব শেখাই হল প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শেখা।

প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শিখনের দৃষ্টান্ত হিসাবে থর্নডাইকের একটি প্রসিদ্ধ পরীক্ষণের উল্লেখ করা যায়। একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালকে একটি খাঁচার মধ্যে বন্ধ করে খাঁচার বাইরে খাবার রাখা হল। খাঁচাটার দরজায় এমন একটি ছিটকিনি লাগানো ছিল যাতে আস্তে চাপ দিলেই দরজাটা নিজে নিজে খুলে যায়। ক্ষুধার্ত বিড়ালটি খাঁচা থেকে বেরিয়ে খাবারে পৌঁছনোর জন্য বার বার চেষ্টা করতে লাগলো। বেশ কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীন ও বিশৃঙ্খলভাবে চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ ছিটকিনির উপর তার পা পড়ে যায় এবং তার ফলে দরজাটা খুলে যায়। সঙে সঙ্গে বিড়ালটি খাঁচা থেকে বেরিয়ে তার অভীষ্ট খাবারে পৌঁছয়।

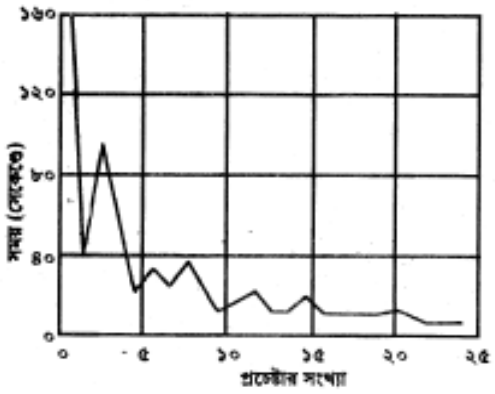

দ্বিতীয় দিনেও তাকে ঠিক ঐভাবে খাঁচায় বন্ধ করে রাখা হয় এবং বাইরে খাবার রেখে দেওয়া হয়। সেবারও বিড়ালটি ঐভাবে এলোমেলো চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ খাঁচার দরজা খুলে খাবারে গিয়ে পৌঁছায়। কিন্তু দেখা যায় যে দ্বিতীয় দিনে প্রথম দিনের তুলনায় মোট ভুল প্রচেষ্টার সংখ্যা কম হয় এবং খাঁচা থেকে বেরোনোর সময়ও কম লাগে। তৃতীয় দিনেও বিড়ালটিকে একইভাবে খাঁচায় বন্ধ করে রাখা হয় এবং ঐভাবে তার সামনে খাঁচার বাইরে খাবার রাখা হয়। সেদিনও ঐ একইভাবে কিছুক্ষণ বিশৃঙ্খল ও উদ্দেশ্যহীন চেষ্টা করার পর বিড়ালটি খাঁচা থেকে বেরোতে সমর্থ হয়। তবে তৃতীয় দিনে তার খাঁচা থেকে বেরোতে দ্বিতীয় দিনের চেয়ে কম সময় লাগে এবং ভুল প্রচেষ্টার সংখ্যাও কম হয়। এইভাবে পরীক্ষণটি চালিয়ে নিয়ে গেলে দেখা যায় যে যতই দিন যাচ্ছে ততই বিড়ালটির ভুল প্রচেষ্টার সংখ্যা কম হয়ে আসছে এবং খাঁচা থেকে বেরোতে আগের দিনের চেয়ে তার সময়ও কম লাগছে। শেষকালে এমন একদিন এল যখন দেখা গেল যে বিড়ালটি আর একটিও ভুল প্রচেষ্টা করলো না। খাঁচায় তাকে বন্ধ করা মাত্রই সে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে খাবারে পৌঁছল। অর্থাৎ সেদিনই বিড়ালটির শিখন সম্পূর্ণ হল। বিড়ালটির বার বার প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে উদ্দীপকের সঙ্গে ঠিক প্রতিক্রিয়াটির সংযোজন করতে সমর্থ হল।

টিপ্পনী

বিড়ালটির এই প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শিখনের অগ্রগতির একটা আনুমাণিক চিত্ররূপ দেওয়া হল।

থর্নডাইকের শিখনের সূত্রাবলী

থর্নডাইক শিখন-প্রক্রিয়া নিয়ে তাঁর দীর্ঘ গবেষণার উপরে ভিত্তি করে শিখনের কতকগুলি সূত্র উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর দেওয়া সূত্রের সংখ্যা আটটি, তিনটি মুখ্য সূত্র এবং পাঁচটি গৌণ সূত্র।

শিখনের তিনটি মুখ্য সূত্র

থর্নডাইকের মতে শিখনের তিনটি মুখ্য সূত্র হল-১। প্রস্তুতির সূত্র, ২। অনুশীলনের সূত্র, এবং ৩। ফললাভের সূত্র। নীচে এই সূত্রগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল।

১। প্রস্তুতির সূত্র

শিখনের জন্য প্রয়োজন হল বিশেষ একটি উদ্দীপকের সঙ্গে তার উপযোগী প্রতিক্রিয়াটিকে সংযুক্ত করার জন্য শিক্ষার্থীর প্রস্তুতি। যখন শিক্ষার্থীর এই প্রস্তুতি থাকে তখন শিখন সন্তোষ আনে, আর যখন শিক্ষার্থীর এই প্রস্তুতি থাকে না তখন শিখন অতৃপ্তির সৃষ্টি করে। এই জন্যই শিশু যখন কোন কাজ করতে উন্মুখ হয় তখন যদি তাকে বাধা দেওয়া হয় সে তাতে বিরক্ত হয়। আবার যে কাজ করতে তার মন চায় না সে কাজ তাকে জোর করে করাতে গেলে তার বিরক্তি আসে। কিন্তু যে কাজ করার জন্য সে দেহ-মনে প্রস্তুত সে কাজ তাকে করতে দিলে সে আনন্দ পায় এবং সেটি সে দ্রুত সম্পন্ন করে।

২। অনুশীলনের সূত্র

একটি বিশেষ উদ্দীপকের সঙ্গে একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়াকে যদি বার বার সংযুক্ত করা যায় তবে সে দুটির মধ্যে একটা সংযোগ বা বন্ধন সৃষ্টি হবে। বিপরীতক্রমে একটি উদ্দীপক ও তার প্রতিক্রিয়াটির মধ্যে যদি বেশ কিছুদিন সংযোজন না করা হয় তবে এ দুয়ের মধ্যে পূর্ব-স্থাপিত সংযোগ বা বন্ধন ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসবে। এক কথায় অনুশীলন উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার বন্ধনকে দৃঢ় করে, অনুশীলনের অভাব তাকে শিথিল করে তোলে।

টিপ্পনী

৩। ফললাভের সূত্র

উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোজনের ফল শিক্ষার্থীর কাছে হয় সন্তোষজনক হবে, ন অতৃপ্তিকর হবে। যদি সংযোজনের ফল সনোষজনক হয় তবে সে সংযোজন দৃঢ়বদ্ধ হবে। আর সংযোজনের ফল যদি অতৃপ্তিকর হয় তবে সে সংযোগ দুর্বল হয়ে উঠবে। যেমন, বিড়ালটির ভুল প্রচেষ্টাগুলির ক্ষেত্রে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সংযোজনের ফল তার কাছে অতৃপ্তিকর হয়েছিল, কেননা সেগুলির দ্বারা সে তার অভীষ্ট খাদ্য পায়নি। সেজন্য ভুল প্রচেষ্টার একটিও সে ভবিষ্যতে শিখল না। কিন্তু দরজা-খোলা-রূপ নির্ভূল প্রচেষ্টাটির ফল তার কাছে সন্তোষজনক হয়েছিল। সেইজন্যই ঐ ক্ষেত্রে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোজনটি তার কাছে স্থায়ী শিখন হয়ে দাঁড়ালো। অর্থাৎ সে দরজা খুলতে পারার কৌশলটি স্থায়ীভাবে শিখলো। থর্নডাইকের মতে এই ফললাভের সূত্রটি শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিখনের পাঁচটি গৌণ সূত্র

শিখনের তিনটি মুখ্য সূত্র ছাড়াও থর্নডাইক আরও পাঁচটি সূত্র গঠন করেন। এগুলি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বলে এগুলি শিখনের গৌণ সূত্র নামে পরিচিত। সেগুলি হল-

১। একই উদ্দীপকের উদ্দেশ্যে বিবিধ প্রতিক্রিয়ার সূত্র

অনেকগুলি ভুল প্রতিক্রিয়ার মধ্যে থেকে বিশেষ একটি নির্ভূল প্রতিক্রিয়াকে বেছে নেওয়াই হল লিখন। অতএব শিখনের জন্য প্রাণীর একটি বিশেষ উদ্দীপকের উদ্দেশ্যে নানা বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করার ক্ষমতা থাকা চাই। এই প্রতিক্রিয়ার বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য যত বাড়বে ততই তার পক্ষে জটিল শিখন আয়ত্ত করা সম্ভব হয়ে উঠবে।

২। মানসিক অবস্থা বা মনোভাবের সূত্র

শিক্ষার্থীর সামগ্রিক মনোভাব বা মানসিক অবস্থার উপর তার শিখন নির্ভর করে এবং শিখনটি তৃপ্তিকর না অতৃপ্তিকর তাও নির্ধারিত হয় তার দেহমনের তৎকালীন অবস্থার দ্বারা।

৩। আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র

কখনও কখনও উদ্দীপক বা শিখন-পরিস্থিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সমগ্র ও অভীষ্ট প্রতিক্রিয়াটির জন্ম দিতে পারে।

৪। সদৃশীকরণ বা উপমানের সূত্র

পূর্ব-পরিচিত শিখন পরিস্থিতির অনুরূপ কোন পরিস্থিতিতে পড়লে প্রাণী সাধারণত পূর্বে সম্পন্ন প্রতিক্রিয়ারই অনুকরণ করে থাকে।

৫। অনুসঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্র

টিপ্পনী

সময় সময় যে উদ্দীপকের যে প্রতিক্রিয়া সেই উদ্দীপক থেকে অন্য আর একটি উদ্দীপককে সেই প্রতিক্রিয়াটি সঞ্চালিত হয়ে যেতে পারে। যেমন, কোন কিছু খাবার সময় জিভে লালাক্ষরণ হওয়াটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু খাবার দেখলে বা খাবারের নাম শুনলে জিভে যে জল আসে সেটা হল প্রতিক্রিয়ার অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের ফল। বিখ্যাত রুশ শরীরতত্ত্ববিদ্ প্যাভলভ এই প্রতিক্রিয়ার নাম দিয়েছেন অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া এবং তার উপর দীর্ঘ গবেষণার ফলে তিনি এই ধরনের অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেছেন। 'অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া'কে আমরা শিখনের স্বতন্ত্র মতবাদরূপে গ্রহণ করেছি এবং যথাযথস্থানে আমরা এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করব। 'অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া'র তত্ত্বটি আবিষ্কারের সম্মান সর্বসম্মতিক্রমে প্যাভলভকে দেওয়া হলেও একথঅ অনস্বীকার্য যে থর্নডাইক প্যাভলভের আগেই এই তত্ত্বটির শিখনমূলক গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে থর্নডাইকের মতবাদ

থর্নডাইকের বর্ণিত শিখনের সূত্রগুলি থেকে আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য এমন কতকগুলি অতি মূল্যবান সিদ্ধান্ত গঠন করতে পারি। সেগুলি হল এই-

প্রথমত, শিখন নির্ভর করছে শিক্ষণীয় বস্তুটি গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতির উপর। প্রস্তুতি বলতে বোঝায় শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভঘটিত প্রভৃতি সমস্ত দিকগুলির একটা সামগ্রিক উন্মুখতা। যে শিখনের জন্য শিক্ষার্থী প্রস্তুত নয় সে শিখন ব্যর্থ হতে বাধ্য। এই প্রস্তুতি আবার দু'শ্রেণীর হতে পারে। প্রথমত, জ্ঞানমূলক প্রস্তুতি অর্থাৎ যে বস্তুটি শিক্ষার্থী শিখতে চলেছে সেটি শেখার উপযোগী পূর্বজ্ঞান তার থাকা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, যে ছাত্রকে জ্যামিতির উপপাদ্য শেখানো হচ্ছে দেখতে হবে যে সে কোণ, ত্রিভূজ ইত্যাদি কাকে বলে তা আগে থেকে জানে কিনা। দ্বিতীয় হল প্রক্ষোভঘটিত প্রস্তুতি। শিখন পদ্ধতি, বিষয়বস্তু প্রভৃতির দিক দিয়ে শিক্ষার্থীর অনুকূল প্রক্ষোভ থাকাও একান্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, শিখনের ফল যেন শিক্ষার্থীর নিকট তৃপ্তিকর হয়। অতৃপ্তিকর শিখন স্থায়ী হয়না। একমাত্র সেই শিখনই স্থায়ী হয় যার ফল শিক্ষার্থীর কাছে তৃপ্তিকর বলে প্রমাণিত হয় এবং একমাত্র সেই শিক্ষার জন্যই শিক্ষার্থী স্বাভাবিক প্রেরণা বোধ করে। এইজন্য এমনভাবে শিখনকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীকে সাফল্যের আনন্দ লাভের জন্য দীর্ঘকাল অপেৰা করে থাকতে না হয়। শিক্ষণীয় বস্তুটি যদি অতিদীর্ঘ হয় তবে সেটিকে একসঙ্গে শিখতে দিলে শিক্ষার্থীর পক্ষে সাফল্যের আনন্দ পাওয়াটা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠবে এবং ফলে তার প্রচেষ্টাও বাধাপ্রাপ্ত হবে। সেইজন্য শিক্ষার বিষয়বস্তু দীর্ঘ হলে সেটিকে এমনভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে নিতে হবে যাতে শিক্ষার্থী তার প্রচেষ্টার মাঝে মাঝে সাফল্যের আনন্দ পায় এবং তার ফলে তার শিখন সুখকর ও সহজসাধ্য হয়ে ওঠে।

তৃতীয়ত, অনুশীলনের উপর শিখন বিশেষভাবে নির্ভরশীল। অতএব শিক্ষার্থী যাতে শিক্ষণীয় বিষয়টি বার বার চর্চা বা অভ্যাসের মাধ্যমে শেখে সেদিকে সযত্ন দৃষ্টি রাখতে হবে। সেজন্য শিখনের বিষয়বস্তুটিকে নিয়ন্ত্রিত এবং সুবিভক্ত করে দিতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর পক্ষে পাঠ অনুশীলন করতে অযথা কোন অসুবিধা না হয়। মনে রাখতে হবে যে এই বার বার প্রচেষ্টা বা অনুশীলনের একটা বড় উপকরণ হল শিক্ষার্থীর শিখন সম্বন্ধে তৃপ্তিবোধ।

চতুর্থত, প্রতিক্রিয়ার বৈচিত্র্য ও বিবিধতা শিক্ষণকে ত্বরান্বিত করে তোলে। অতএব যাতে শিক্ষার্থী গতানুগতিক ও পুরাতন প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর না করে এবং যাতে সে নতুন ও বৈচিত্র্যময় প্রতিক্রিয়া আবিষ্কার করতে পারে, সেজন্য তাকে উৎসাহ ও যথাযথ নির্দেশ দিতে হবে।

টিপ্পনী

পঞ্চমত, শিখন-পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক জানাটা শিক্ষার্থীর পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে শিক্ষণীয় বস্তুটির এমন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অংশ থাকতে পারে যেগুলি সমগ্র পরিস্থিতিটিকেই নিয়ন্ত্রিত করে এবং যেগুলি সম্বন্ধে সচেতনতা সমস্যাটিকে সহজে সমাধান করতে সাহায্য করে। এগুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জ্ঞান থাকলে শিখন কার্য অল্পায়াসে ও দ্রুত সম্পন্ন হয়। অতএব যাতে শিক্ষার্থী শিখন পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্পর্ক অনুধাবন করতে শেখে তার ব্যবস্থা করা দরকার।

থর্নডাইকের সংযোজনবাদের সমালোচনা

নানা মনোবিজ্ঞানী থর্নডাইকের সংযোজনবাদ এবং তার শিখনের সূত্রগুলির বিরূপ সমালোচনা করেছেন। অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীই থর্নডাইকের সূত্রগুলিকে শিখনের পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে সূত্রগলি যদিও বাহ্যত প্রযোজ্য বলে মনে হয়, তবুও ভাল করে বিচার করলে সেগুলির মধ্যে প্রচুর অসম্পূর্ণতা ধরা পড়ে। তাঁদের সমালোচনার প্রধান প্রধান বক্তব্যগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

প্রথমত, থর্নডাইকের অনুশীলনের সূত্র অনুযায়ী কোন কিছু বার বার অভ্যাস বা চর্চা করলে সে বস্তুটির শিখন স্থায়ী হয়। একথা আংশিকভাবে সত্য। কেননা কেবলমাত্র অভ্যাস বা চর্চা করলেই স্থায়ী শিখন হতে পারে না। তার সঙ্গে আগ্রহ, মনোযোগ, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলিও থাকা দরকার। আর যেখানেই এই অত্যাবশ্যক বস্তুটির অভাব সেখানে নিছক অভ্যাস মোটেই কার্যকর হয় না। এই কথায় অনুশীলনের সাফল্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরও অসংখ্য বস্তুর প্রভাব এবং এগুলির একটার অভাবেই হাজার অনুশীলন সত্ত্বেও শিখন সফল না হতেও পারে। আবার অপর দিকে বিন্দুমাত্র অভ্যাস বা চর্চা ছাড়াই বহু অভিজ্ঞতা স্থায়ীভাবে আমাদের মনে ছাপ রেখে যায়। যেমন আনন্দের, শোকের বা উত্তেজনাপূর্ণ কোন ঘটনার অভিজ্ঞতা। বিশেষ করে যখন আমরা অর্থপূর্ণ কিছু শিখি তখন কোনরূপ অনুশীলনের সাহায্যই লাগে না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে অনুশীলন শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ নয়।

থর্নডাইকের সংযোজনবাদের স্বপক্ষে প্রায়ই শিখনের একটা শরীরতত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী মস্তিষ্কের স্নায়ুমন্ডলীতে বিশেষ বিশেষ স্নায়ুগুলির মধ্যে সংযোগস্থাপনই হচ্ছে শিখন। থর্নডাইক যাকে উদ্দীপক- প্রতিক্রিয়ার সংযোগ বলেন শরীরতত্ত্বের ব্যাখ্যায় সেটি হল মস্তিষ্কের দুটি নিউরনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন। সাধারণত দুটি নিউরনের

সন্নিকর্ষ স্থলে এই সংযোগ প্রক্রিয়াকে বাধা দেবার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। কিন্তু বার বার একই কাজ অনুশীলন করলে এই বাধা দূর হয়ে যায় এবং দুটি নিউরনের মধ্যে একটি স্থায়ী স্নায়ুমূলক সংযোজন স্থাপিত হয় এবং তারই ফলে শিখন সংঘটিত হয়।

শিখনের এই শরীরতত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা আজকাল অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীই মানতে রাজী নন। ল্যাস্‌লে, ফ্রানজ, ক্যামেরন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গবেষকগণ প্রমাণ করেছেন যে স্নায়ুমূলক সংযোজনের মাধ্যমে শিখন প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না।

টিপ্পনী

থর্নডাইকের ফললাভের সূত্রটির নানারূপ সমালোচনা হয়েছে। এই সূত্র অনুযায়ী আচরণের ফলে তৃপ্তিকর হলে সে আচরণটি দৃঢ়বদ্ধ হয়, আচরণের ফল অতৃপ্তিকর হলে সে আচরণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। ওয়াটসন প্রমুখ আচরণবাদীরা এই সূত্রটির তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তার কারণ হল যে এই সূত্রটিকে শিখন প্রক্রিয়াটির পেছনে ব্যক্তির মানসিক অনুভূতির ভূমিকা স্বীকার করা হচ্ছে। কিন্তু আচরণবাদীরা মানসিক অনুভূতির সাহায্যে কোন কিছুরই ব্যাখ্যা মেনে নিতে রাজী নন। তারা থর্নডাইকের ফললাভের সূত্রের স্থানে অনুশীলন এবং আচরণের সাম্প্রতিকতা-এই দুটি সূত্রের সাহায্যে শিখনের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন।

অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীরা ফললাভের সূত্রটির বিরোধিতা করেন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণের জন্যে। তাঁদের মতে সুখ বা দুঃখের অনুভূতি যদি কোন আচরণের শিখন বা বিলুপ্তির কারণ হয়ে থাকে, তাকে সে অনুভূতিটি নিশ্চয়ই ঐ আচরণটির সম্পাদনের পূর্বে ঘটবে। কেননা, কারণ সর্বদাই কার্যের আগে ঘটে থাকে। অথচ এই ক্ষেত্রে শিখন-রূপ আচরণটি ঘটছে আগে, তার পরে ঘটছে দুঃখ বা সুখের অনুভূতিটি। অতএব এখানে সুখ বা দুঃখের অনুভূতিকে শিখন হওয়া বা না হওয়ার কারণ বলা চলে না।

তাছাড়া দুঃখের অনুভূতি যে সব সময়েই আচরণের বিলোপ ঘটায় একথাও ঠিক নয়। নানা পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে বহু বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাও খুব স্বাভাবিকভাবেই এবং দীর্ঘদিন মনের মধ্যে সন্নিবদ্ধ থাকে। এই সকল আলোচনা থেকে বলা যেতে পারে যে শিখন এবং সুখ-দুঃখের অনুভূতির মধ্যে যদিও সম্পর্ক আছে তবুও এই দু'য়ের মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না।

অনেক মনোবিজ্ঞানীর মতে থর্নডাইকের সূত্রগুলি কেবল ত্রুটিপূর্ণই নয়, সেগুলিকে শিখন প্রক্রিয়ার বহু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যেমন, শিখনের একটি বড় অঙ্গ হল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর সচেতনতা। কিন্তু থর্নডাইকের সূত্রগুলিতে তার কোন উল্লেখ নেই। তাছাড়া শিখন প্রক্রিয়াতে প্রক্ষোভের ভূমিকাও একটি বড় স্থান অধিকার করে থাকে, কিন্তু তারও কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা থর্নডাইকের সূত্রগুলিতে পাওয়া যায় না।

থর্নডাইক নিজেও তাঁর সূত্রগুলির অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেইজন্য পরে তাঁর প্রদত্ত তিনটি সূত্রের সঙ্গে আর একটি সূত্র যোগ করে দেন। এই সূত্রটির নাম হল অন্তর্ভুক্তির সূত্র। এই সূত্রের অর্থ হল যে শিখন তখনই সম্ভব হবে যখন উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পারস্পরিক অন্তর্ভুক্তির একটি সম্পর্ক থাকবে অর্থাৎ যখন দুটি ঘটনাই বিশেষ একটি সম্পর্কের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। থর্নডাইকের এই সূত্রটি নানা দিক দিয়ে বেশ অনির্দিষ্ট প্রকৃতির ও অস্পষ্ট।

গেস্টাল্টবাদী মনোবিজ্ঞানীরা থর্নডাইকের সংযোজনবাদ এবং তাঁর প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শিখনের তত্ত্বটির তীব্র সমালোচনা করেছেন। থর্নডাইকের মনে শিখন হল একটি বিশেষ উদ্দীপকের সঙ্গে একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়ার মিলন ঘটানো। প্রাণী যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন সে সেই পরিস্থিতি থেকে একটির পর একটি উদ্দীপক বেছে নেয় এবং একটির পর একটি প্রতিক্রিয়া দিয়ে তার সাড়া দেয়। এইভাবে সাড়া দিতে দিতে হঠাৎ ঠিক উদ্দীপকটির সঙ্গে ঠিক প্রতিক্রিয়াটির সংযোজন ঘটে যায় এবং তখনই শিখন সংঘটিত হয়। একেই বলা হয়েছে উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার সংযোজন।

টিপ্পনী

গেস্টাল্টবাদী মনোবিজ্ঞানীরা শিখনের এই ব্যাখ্যাটিকে মনোবৈজ্ঞানিক আণবিকতা বলে সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে সমস্যামূলক পরিস্থিতির অন্তর্গত উদ্দীপকগুলিকে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে এক একটি প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে সাড়া দিই না। আমরা শিখনের সমগ্র পরিস্থিতিটিকে আমাদের সমগ্র প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দিয়ে থাকি। এই সাড়া দেবার সময় আমরা ঐ পরিস্থিতির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করি এবং তাদের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি অনুযায়ী সেগুলিকে পুনরায় সংগঠিত করে নিই। গেস্টাল্টবাদীদের মতে সমস্যাটির এই অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক নিরূপণ এবং উদ্দীপকগুলির সংগঠনের মাধ্যমেই প্রকৃত শিখন ঘটে থাকে।

অনুশীলনী

১ সাপেক্ষীকরণ বলতে কী বোঝ?

২ শিখনের ক্ষেত্রে সাপেক্ষীকরণের কী প্রভাব রয়েছে?

৩ Thorndike প্রবর্তিত সংযোগ বাদ বিচারমূলক আলোচনা করো।

করা সহজ হয়। এক্ষেত্রে শিশুর পাখি কথাটির শিক্ষা পাখি বস্তুটির পূর্বজ্ঞানের অপেক্ষা রাখে।

Watson বলেছেন অনুশীলন বা পৌনঃপুনিকতা অথবা এবং সাম্প্রতিকতা এই দুটো নিয়ম দিয়েই শিক্ষা ব্যাখ্যা করা যায়। তাঁর মতে শিক্ষার ব্যাখ্যায় চেতনা বা মন প্রভাবিত মানস বৃত্তি স্বীকার করার কোনো প্রয়োজননেই। পৌনঃপুনিকতা সূত্রে প্রয়োজন হয় যে বারবার চেষ্টার ফলে সাফল্য লাভ হয়। ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়ার তুলনায় সফল প্রতিক্রিয়ার সংখ্যা বেশি।

প্রায়োগিক মনো বিদ্যায় Watson সমর্থিত সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। এই গবেষণা শিশু শিক্ষা ক্ষেত্রে যুগান্তর ঘটিয়েছে। আগে শিক্ষা ব্যাপারটা অস্পষ্ট ছিল কিন্তু বর্তমানে এটা আরও স্পষ্ট হয়েছে তার মূলে যে সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের প্রভাব হয়েছে তা অনস্বীকার্য। শিক্ষায় অনুষঙ্গ প্রভাব বিস্তার করে এত সন্দেহ নেই । শিশুর শিক্ষা যে মূলত কতকগুলো সাপেক্ষ প্রতিবর্তের প্রতিষ্ঠা এবং অভ্যাস রুপ স্থায়ী প্রতিবর্ত গঠন তা সাম্প্রতিক মনোবিদ্যার একটি স্বীকৃত সত্য। মেধাবী শিক্ষার্থী অল্পায়াসেই সাপেক্ষ প্রতিবর্ত করতে পারে কিন্তু মন্দোধী শিক্ষার্থী পারে না। তাছাড়া শিক্ষা যে শিক্ষকের আয়ত্তাধীন সাপেক্ষ রতিবর্তবাদ সেদিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এই মতবাদ অনুযায়ী ইচ্ছানুরুপ শিক্ষা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে আশানুরুপ শিক্ষা ফল লাভ করা যায়।

কিন্তু এই মতবাদের মস্ত বড়ো ত্রুটি হল যে শিখণ তত্ত্ব একান্তই যান্ত্রিক। এতে শিক্ষর্থীর ইচ্ছা মনোযোগ আগ্রহ প্রভৃতির কোনো স্থান নেই। শিক্ষা কেবল সাপেক্ষ প্রতিবর্তক্রিয়ার শৃঙ্খল

নয়। এটা বরঞ্চ একটা সহযোগিতা মূলক ক্রিয়া যে খানে জীব সামগ্রিকভাবে অংশগ্রহণ করে। তাছাড়াWatson বলে এর মতবাদ খুব একটা উন্নত নয়। অনুশীলনের সূত্রকে শিক্ষণের মূল সূত্র বলেছেন। তাঁর মতে Thorndike খাঁচা থেকে বিড়ালের বেরিয়ে আসার শিক্ষণ যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাWatson এর মতে বারবার অনুশীলনের প্রচেষ্টা বিড়ালকে সাফল্য এনে দিয়েছিল। এর সঙ্গে প্রীতিকর অবস্থার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু এর এই মত গ্রহণ যোগ্য নয়। তবে একথা ঠিক যে যে সকল আচরণের ফলে বিড়াল খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছিল সে সেই আচরণটিই শুধু শিখেছিল। কাজেই ফল লাভের সূত্রকে বাদ দিয়ে চেষ্টিতবাদী Watson যান্ত্রিক ভাবে শিক্ষণের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

টিপ্পনী

■ অর্থপূর্ণ শিখন (Meaningful Learning)

গেস্টাল্টবাদী দের মতে শিখন বাস্তবিক পক্ষেই অর্থপূর্ণ। তাঁদের মতে আমাদের প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতাই একটি অনুপম সমগ্র বা গেস্টাল্ট। আমরা যখনই কোনো কিছু প্রত্যক্ষ করি তখন তাকে কতকগুলো অংশের যোগফল হিসেবে না দেখে একটা সমগ্র হিসাবে প্রত্যক্ষ করি। যে সকল বস্তু পরস্পরের কাছে থাকে বা যাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে তাদের আমরা একক হিসেবে প্রত্যক্ষ করি এবং একটা সমগ্র জিনিসের বিভিন্ন অংশে পৃথক পৃথক থাকলেও আমরা তাদের পৃথক ভাবে প্রত্যক্ষ না করে একটা সমগ্র হিসেবে প্রত্যক্ষ করি। তাঁরা মনে করেন শিখন অন্ধ ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। শিখনের মধ্যে সমগ্র পরিস্থিতি সম্পর্কে সমগ্র দৃষ্টি বা অন্তদৃষ্টি থাকে। শিখন একটা সমগ্র শিক্ষনীয় পরিস্থিতির অন্তদৃষ্টি এটা সমগ্র পরিস্থিতির দ্রুত এককালীন অন্তদৃষ্টির ফল।

Kohler শিম্পাঞ্জির ওপর গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন যে শিম্পঞ্জিরা কী ভাবে বস্তু প্রত্যক্ষ করে বা শেখে। তিনি লক্ষ করলেন যে সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে শিম্পাঞ্জিদের বিশৃঙ্খল চেষ্টার আকস্মিক অবসান হয় অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে সমগ্র পরিস্থিতির উপলব্ধির জন্য।

Kohler বেশ কিছু শিম্পাঞ্জির ওপর পরীক্ষণ কার্য পরিচালনা করেছিলেন এর মধ্যে একটা বিশেষ চমকপ্রদ পরীক্ষণ হল শিম্পাঞ্জিদের নাগালের বাইরে অনেক উঁচুতে কলা ঝুলছিল। সে দুটো পৃথক লাঠি দিয়ে ওই কলা টেনে নেওয়ার বৃথাই চেষ্টা করছিল কারণ পৃথক ভাবে লাঠি দুটো কলার নাগাল পাবার পক্ষে ছোটো। খাদ্য না পাওয়া তে সে লাঠি নিয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে খেলা করতে থাকল। এইরুপ করতে করতে শিম্পাঞ্জিটি হঠাৎ একটি লাঠ অপরটির প্রান্তে জুড়ে দিয়ে কলা টেনে নিল। অর্থাৎ শিম্পাঞ্জি এতক্ষণ লাঠি দুটোকে সমগ্র পরিস্থিতির অংশরুপে দেখেনি দেখেছে পৃথক পৃথক ভাবে। এবার দুটো যুক্ত লাঠি দ্বারা কী ভাবে কলার নাগাল পাওয়া যায় তা আবিস্কার করল।

অতএব কোনো সমস্যার সমাধান করতে হলে সমস্যাটা যে পরিস্থিতির অন্তগত সেই পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশকে জানলেই চলবে না অংশগুলোর মধ্যে য়ে অন্তর্নিহিত সংগঠন organisation টি আছে তারও যথার্থ স্বরুপটি উপলব্ধি করতে হবে। শিখনের সময় যে প্রাণী শিখন পরিস্থিতির মধ্যে সম্পর্ক ধারা আবিস্কার করতে পারে এবং তাদের স্বরূপ অনুযায়ী তাদের একত্রিত করে নিতে পারে তখনই সে প্রাণীর মধ্যে দেখা দেয় অন্তর্দৃষ্টি insight অন্তদৃষ্টির মাধ্যমে শিখন হয় দ্রুত এবং এককালীন শিক্ষা। এই শিখন মোটেই ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় না।

অন্তর্দৃষ্টির সাথে সাথে সমগ্র প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রের বস্তুগুলির বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটে। অন্তর্দৃষ্টি নতুন আবিস্কারের অনুরূপ। এটা নতুন উন্মেষকালীন চেতনা। এই চেতনা তড়িৎগতিতে প্রকাশ illumination পায়। এটাও সত্য যে অন্তদৃষ্টি পশ্চাৎসৃষ্টি hind sight এবং সম্মুখ দৃষ্টি fore sight ও বটে। অন্তদৃষ্টির মধ্যে সমগ্র পরিস্থিতির অগ্র পশ্চাৎ দৃষ্টি রয়েছে।

অন্তদৃষ্টির মাধ্যমে যে শিখন এবং সেই সংক্রান্ত যে মতবাদ তাকে সমগ্র দৃষ্টিবাদ বলা হয় এটা যদিও শিক্ষাতত্ত্বে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে তবুও শিখন ব্যাপারে এই মতবাদেই যে সব কথাও শেষ কথা বলেছে তা স্বীকার করা যায় না খুব প্রাসঙ্গিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে বিদ্যালয়ে প্রচলিত শিক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে মতবাদের পরেয়োগ আছে কি? বহু াগে বিদ্যালয়ে বা মহাবিদ্যালয়ে বা মহাবিদ্যালয়ে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাতে একটা বিশেষ ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হত। অধীতন বিষয় গুলোকে কতকগুলো ছোটোছোটো অংশে ভাগ করে শিক্ষর্তীকে ওই ছোটো ছোটো অংশ আলাদা আলাদা ভাবে শোকানোর প্রথা ছিল। এর ফলে শিক্ষার্থী অধীতক বিষয়ের সামগ্রিক রূপটা দেখতে পেত না এবং তার শেখার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ভাবে শিক্ষকের দ্বারা পরিচালিত হত। সেই কারণে তার শিক্ষণ ছিল অন্ধ ও যান্ত্রিক পুরোনো পদ্ধতির নাম ছিল বিশ্লেষক পদ্ধতি । সেই পদ্ধতি পরিবর্তন করে এখন শিক্ষা ক্ষেত্রে আনা হয়েছে সংশ্লেষক বা সমগ্র পদ্ধতি অথবা। পুরোনো শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ থেকে যাওয়া হয় সংশ্লেষণে। পক্ষান্তরে বর্তমান শিক্ষাদনের পদ্ধতির এই আমূল পরিবর্তনের মূলে আছে বাদীদের চিন্তাধারা। শিক্ষক যখন শ্রেণীকক্ষে অনুশীলনী শিক্ষার্থীদের জন্যে সুসংবদ্ধ করেন শিক্ষককে মনে রাখতে হবে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের দেওয়া জন্য যে অনুশীলনী তৈরী করা হয়েছে সেগুলো যেন অর্থপূর্ণ সমগ্রতা য় বিন্যস্ত থাকে। এর ফলে মুহূর্তের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষ হবে। বাদীদের মূল বক্তব্য যে কোনে কিছুকেই সমগ্র একক হিসেবে নিতে হবে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীর দের যা কিছুই শেখান না কেন অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট অনুশীলনী যেন পরস্পরের থেকে বিছিন্ন না থাকে। gestalt বাদীদের মতে সমগ্রই অংশকে নির্ধারণ করে থাকে। শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে অর্থাৎ শিক্ষার্থীর ধ্যান ধারণা যে খানে অবস্থান করছে সেখান থেকে শিক্ষককে শুরু করতে হবে। শিক্ষকের ধ্যান ধারণা থেকে শিক্ষার্থীকে খিছু শেখালে চলবে না। শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষানীয় বিষয়ের বিভিন্ন অংশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উপলব্ধি করার জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের অভ্যাস সৃষ্টি করতে হবে। এই অভ্যাস সৃষ্টি করবেন শিক্ষক এর ফলে শিক্ষার্থী খুবসহজে এবং দ্রুত শিখতে পারবে।

শিক্ষার্থী যখন কোনো কিছু শেখার চেষ্টা করে তখন তার একটা অভ্যন্তরীন মানসিকপ্রস্তুতি থাকো দরকার। শিক্ষণীয় বস্তুটি গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীকে তার অতীত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। অর্থাৎ আগে সে যতটা শিখেছে সেটা বর্তমানে শিক্ষণীয় বিষয়কে শেখবার জন্য কতটা তাকে সাহায্য করছে। শিক্ষণীয় বস্তুটি আয়ত্ত করবার জন্য যথেষ্ট পূর্বজ্ঞান যেন শিক্ষার্থীর মধ্যে থাকে। আমি শিখবই এই মনোভাব শিক্ষার্থীর মধ্যে থাকতেই হবে যতই শিক্ষকের পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকুক না কেন। তা না হলে শিক্ষার্থীর শিখন বিলম্বিত হতে পারে। gestalt মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিক্ষার্থী তার সামগ্রিক দিয়ে প্রতিক্রিয়া করে। এই ভাবে দেখ যায় যে শিখনের জন্য সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতি ভীষণ প্রয়োজন।

টিপ্পনী

■ Gestalt মতবাদের তাৎপর্য (Significance of Gestalt theory)

Gestalt মতবাদ আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে ভীষণ ভাবে প্রভাবিত করেছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর শিখন পরিস্থিতির সামগ্রিক বোধের ওপর নির্ভর করে। শিক্ষক যখন শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করবেন তখন তিনি ছাত্রদের কাছে সমস্যা বা বিষয়বস্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে উপস্থাপিত না করে সামগ্রিক ভাবে শিক্ষার্থীর কাছে তুলে ধরতে হবে। শিক্ষককে প্রথমে সমস্যার সামগ্রিক সমাধান করতে হবে তারপর খন্ড খন্ড অংশ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান দেওয়াই হবে শিক্ষকের কর্তব্য।

টিপ্পনী

সমগ্র পরিস্থিতির অংশ গুলোর মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ স্থাপনের মাধ্যমে অন্তর্দৃষ্টি আসে। শিক্ষকের কাজ হবে এই সম্পর্ক স্থাপনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া। শিক্ষককে বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে যথোপযুক্তভাবে এবং তার উপস্থাপনে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে। শিক্ষকের উপস্থাপনা যদি ঠিকমতো না হয় তাহলে অন্তর্দৃষ্টির কোনো প্রশ্নই উঠবে না।

Gestalt মতবাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল শিক্ষার্থী স্বয়ং শিখন পরিস্থিতির একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক। শিক্ষকের কাজই হবে শিক্ষার্থীকে সমস্যা সমাধানে আগ্রহী করা। আগ্রহী করে তুলতে হলে বিষয়বস্তুকে জীবন ও পরিবেশের সঙ্গে সংযুক্ত করে শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরতে হবে।

Gestalt বাদীগণ শিখনের ক্ষেত্রে সামান্যীকরণ এবং পৃথকীকরণ এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে এই দুই কৌশলকে বিশেষভাবে প্রয়োগ করতে হবে। শিক্ষকের কাজ হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন একটা অভাস গড়ে তোলা যার মাধ্যমে কোনো পরিস্থিতিকে শিক্ষার্থী যাথাযথ ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে।

Gestalt মতবাদ বা সমগ্রবাদের অনেক নতুনত্ব রয়েছে। সমগ্রতাবাদীগণ পরীক্ষণ এবং আলোচনার মাধ্যমে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকসম্পাত করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক মনোবিজ্ঞানী একে সমালোচনা করতে ছাড়েননি। অন্তর্দৃষ্টি কে অনেকে শিখনের নতুন কিছু কৌশল বলে মনে করেন না। বোধশক্তি হীন শিশু অনেক আচরণই যান্ত্রিকভাবে শুধুমাত্র অনুকরণের দ্বারাই শেখে কোনো রকম প্রয়োজনের তাড়নায় নয়। শিখন সম্পর্কে মতবাদ সম্পূর্ণ একথা আমরা বলতে পারি না। পরবর্তীকালে এর অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পেলাম যে kohler এর মতে প্রাণীরা অন্তর্দৃষ্টি মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে। এই অন্তর্দৃষ্টি বলতে তিনি কী বুঝিয়েছিলেন এটা কি কোনো উপলব্ধি না কি পরিস্থিতির সামগ্রিক অবলোকন? এই অন্তর্দৃষ্টি শব্দটির অর্থ খুব পরিস্কার নয়।

২। শিখনের গেস্টাল্ট তত্ত্ব

গেস্টাল্ট কথাটি জার্মান শব্দ। এর অর্থ হল গঠন বা কাঠামো বা সম্পূর্ণ আকার। মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে এই মতবাদটি 'মনোবৈজ্ঞানিক আণবিকতা'র প্রতিক্রিয়া রূপে দেখা দেয়। বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া বা সত্তাগুলির বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐ প্রক্রিয়া বা সত্তাগুলির প্রকৃত স্বরূপ জানা যায় বলে যে সব মনোবিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন তাঁদেরই গেস্টাল্টবাদীরা

মনোবৈজ্ঞানিক আণবিকতাবাদী বলে সমালোচনা করে থাকেন। বলা বাহুল্য অনুষঙ্গবাদী মনোবিজ্ঞানীরাই তাঁদের এই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। অনুষঙ্গবাদীরা মানব মনের প্রক্রিয়াগুলিকে বিশ্লেষণ করে সংবেদন, প্রত্যক্ষণ, প্রতিরূপ প্রভৃতি কতকগুলি মানসিক এককের পরিসল্পনা করেন এবং এই মানসিক এককগুলিকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলে পূর্ণ মানসিক প্রক্রিয়াটির যথার্থ স্বরূপ জানা যায় বলে তাঁরা দাবী করেন।

কিন্তু গেস্টাল্টবাদীদের মত অনুযায়ী আমাদের প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্তু সর্বদাই এমন একটি অবিচ্ছিন্ন সমগ্র সত্তা যাকে বিশ্লেষণ করলে বা যার অংশগুলিকে পৃথকভাবে বিচার করলে আমরা সেই সমগ্র সত্তাটিকে কখনও জানতে পারি না। কারণ, সমগ্র সত্তাটি কেবলমাত্র অংশগুলির যোগফল নয়, যোগফলের উপরেও অতিরিক্ত আরও কিছু। যেমন, মনে করুন, আপনি একটি প্রাকৃতিক দেখছেন। এই দৃশ্যটির অন্তর্গত গাছপালা, ফুল, পাখী, পশুগুলিকে পর পর যোগ করে দিলেই আপনার ঐ অভিজ্ঞতার সমগ্র সত্তাটিকে পাওয়া যাবে না। ঐ অংশগুলি তো আপনার অভিজ্ঞতার মধ্যে থাকবেই তার উপরেও থাকবে অতিরিক্ত আরও কিছু। সমগ্র সত্তার এই অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যটি গেস্টাল্টবাদী মনোবিজ্ঞানীদের মতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তারা মনে করেন যে বিভিন্ন অংশগুলির সংগঠন থেকে এই অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যটি দেখা দেয়। এক কথায় বিশেষ কোন শিখন পরিস্থিতির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশগুলি নিজেদের মধ্যে যে একটি সংগঠনের সৃষ্টি করে সেইটিকে গেস্টাল্টবাদীরা গঠন বা কাঠামো বা পূর্ণ আকার নাম দিয়ে থাকেন।

অতএব কোন সমস্যার সমাধান করতে হলে ঐ সমস্যামূলক পরিস্থিতির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশগুলিকে জানলেই চলবে না, ঐ অংশগুলির মধ্যে যে অন্তর্নিহিত সংগঠনটি আছে তারও যথার্থ স্বরূপটি উপলব্ধি করতে হবে। থর্নডাইক যে বলেছেন উদ্দীপকগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে পৃথক পৃথক প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দিয়ে আমরা সমস্যার সমাধানে পৌঁছই এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। আসলে যা ঘটে তা ঠিক তার বিপরীত। যখন আমরা কোনও শিখন পরিস্থিতির সম্মুখীন হই তখন আমরা সমগ্র সমস্যাটি কে আমাদের সমগ্র প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দিই এবং এই সাড়া দেবার সময় পরিস্থিতির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে যে সংগঠন সৃষ্টি করি তারই ফলে সমস্যার সমাধান দেখা দেয় এবং আমাদের শিখন সম্পন্ন হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে গেস্টাল্টবাদীদের মতে থর্নডাইক বর্ণিত প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শেখার প্রক্রিয়াটি আসলে অবাস্তব। অবশ্য শিখনের সময় যে প্রাণী অন্ধ ও অর্থহীন প্রচেষ্টা করে না, তা নয়। কিন্তু সেই সব বিচ্ছিন্ন ও অন্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রকৃত শিখন ঘটে না। প্রকৃত শিখন ঘটে তখনই যখন প্রাণী সামগ্রিক ও লক্ষ্য-উদ্দিষ্ট প্রচেষ্টা সম্পন্ন করে। বস্তুত সকল শিখনের ক্ষেত্রে প্রাণীর প্রচেষ্টা সব সময়েই সমগ্র পরিস্থিতির উদ্দেশ্যে প্রসূত এবং সেগুলির কোনটিই বিচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়া নয়। প্রকৃতপক্ষে শিখনের সময় প্রাণী তার সমগ্র সত্তা দিয়ে সমগ্র সমস্যাটির উদ্দেশ্যে একটি সমগ্র প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে।

থর্নডাইক খাঁচায় বন্ধ বিড়ালের শিখন নিয়ে যে পরীক্ষা করেছিলেন তাতে পরিস্থিতিটি এমন ছিল যে বিড়ালের পক্ষে সমস্যাটির সমগ্র রূপটি উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না। ফলে অন্ধ উদ্দেশ্যহীন প্রচেষ্টা করা ছাড়া তার আর অন্য কোন উপায় ছিল না। কিন্তু যদি পরিস্থিতিটি প্রাণীর কাছে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত থাকে তবে সে কখনই অন্ধ, যান্ত্রিক বা উদ্দেশ্যহীন চেষ্টা করবে না। তখন তার প্রচেষ্টা স্বভাবতই সামগ্রিক, লক্ষ্য-উদ্দিষ্ট ও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

প্রসিদ্ধ গেস্টাল্টবাদী মনোবিজ্ঞানী কোহ্লার শিম্পাঞ্জীর শিখন নিয়ে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা করেন এবং তিনি সুনিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করেছেন যে কোন যান্ত্রিক বা অন্ধ পদ্ধতিতে প্রাণী কখনই কিছু শেখে না। তাঁর বহু প্রখ্যাত পরীক্ষণগুলির মধ্যে নীচে একটির বর্ণনা দেওয়া হল।

একটি শিম্পাঞ্জীকে বড় একটি খাঁচায় বন্ধ করে খাঁচার বাইরে কিছু কলা রাখা হল। খাঁচার মধ্যে রাখা হল দুটি বাঁশের টুকরো। কলাগুলি খাঁচা থেকে এতটা দূরে রাখা হল যাতে কেবলমাত্র হাত বাড়িয়ে বা কোন একটিমাত্র বাঁশের টুকরো দিয়ে সেগুলির নাগাল পাওয়া যায় না। কিন্তু বাঁশের একটি টুকরোর মধ্যে যদি আর একটি টুকরো ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তবে তা থেকে যে লম্বা বাঁশের টুকরোটি পাওয়া যাবে তা দিয়ে কলাগুলির নাগাল সহজেই পাওয়া যাবে। বাঁশের টুকরো দুটিও এমনভাবে কাটা হয়েছিল যাতে একটি আর একটির মধ্যে ঢুকে যায়। শিম্পাঞ্জীটি প্রথমে হাত বাড়িয়ে এবং পরে বাঁশের টুকরো দুটি পৃথকভাবে ব্যবহার করে নানা উপায়ে কলাগুলির নাগাল পাবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু সেভাবে কিছুতেই সে কলাগুলির নাগাল পেল না। তখন সে বাঁশের টুকরো দুটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে শুরু করল এবং এইভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ একটি টুকরোর মধ্যে আর একটি টুকরো ঢুকে গেল এবং টুকরো দুটি জুড়ে গিয়ে একটি লম্বা বাঁশে পরিণত হল। মুহূর্তের মধ্যে শিম্পাঞ্জীটির মধ্যে এক অদ্ভূত পরিবর্তন দেখা গেল। সে আর তখন বিন্দুমাত্র ইতস্তত বা উদ্দেশ্যহীন চেষ্টা না করে সেই লম্বা বাঁশটির সাহায্যে কলাগুলি হস্তগত করলো।

অন্তর্দৃষ্টি

সমস্যাটির সমাধানের এই যে হঠাৎ উপলব্ধি, কোহ্লার এর নাম দিয়েছেন অন্তর্দৃষ্টি। তাঁর মতে সমস্যার সমাধান বা শিখন প্রক্রিয়া অনেকটা বিদ্যুৎ চমকানোর মত প্রাণীর মনকে হঠাৎ আলোকিত করে তোলে এবং তখন প্রাণীর সেই সমাধানটি আয়ত্ত করতে আর বিন্দুমাত্র সময় লাগে না এবং এইভাবে তার যে শিখন হয় তা সে পরে সহজে ভোলেও না। শিখনের সময় ভুল প্রচেষ্টা বা অন্ধ প্রতিক্রিয়া যে একেবারে ঘটে না তা নয়। কিন্তু কোহ্লারের মতে তা থেকে সত্যকারের শিখন ঘটে না। শিখন ঘটে একমাত্র অন্তর্দৃষ্টির আর্বিভাবে এবং তাতে ভুল প্রচেষ্টাগুলির কোনও অবদান বা ভূমিকা থাকে না। অন্তর্দৃষ্টির জাগরণ সম্বন্ধে গেস্টাল্টবাদীরা

শিখন পরিস্থিতির সংগঠন ও তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্কের উপলব্ধির উপর বিশেষ জোর দিয়ে থাকেন। তাঁদের মতে যখনই প্রাণী শিখন পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সম্পর্কধারা নির্ণয় করতে পারে এবং তাদের সামগ্রিক প্রকৃতি অনুযায়ী সংগঠন করে উঠতে পারে তখনই দেখা দেয় অন্তর্দৃষ্টি।

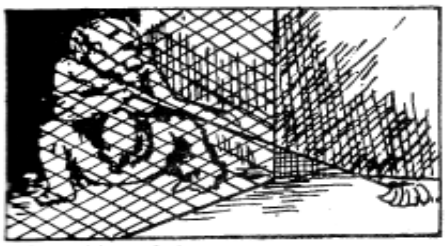

[বাঁশের ছোট টুকরো দুটি হঠাৎ একসঙ্গে জুড়ে একটি বড় বাঁশের টুকরোতে পরিণত হয়ে যাওয়ার পর তা দিয়ে শিম্পাঞ্জীটি কলার ছড়াটা টেনে আনছে]

[অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের উপর কোহ্‌লারের পরীক্ষণ
পৃঃ ২৫২—পৃঃ ২৫৩]

টিপ্পনী

সাধারণত শিখন পরিস্থিতির নানা প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক বস্তু দিয়ে আবৃত থাকে। যখনই শিক্ষার্থী শিখন পরিস্থিতিটির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারে এবং সেগুলিকে একটি অর্থপূর্ণ সংগঠনে রূপান্তরিত করতে পারে তখনই অপ্রাসঙ্গিক বস্তুগুলি নিজে নিজেই দূরে সরে যায় এবং সমস্যার সমাধানটিও শিক্ষার্থীর কাছে তখন উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ে।

গেস্টাল্টবাদীদের মতে অন্তর্দৃষ্টির জাগরণের জন্য দুটি মানসিক প্রক্রিয়ার বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়। সে দুটি হল পৃথকীকরণ ও সামান্যীকরণ। শিখন পরিস্থিতির মধ্যে যেগুলি অপ্রসঙ্গিক ও অবান্তর সেগুলিকে দূরে সরিয়ে রেখে কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক ও সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি বেছে নেওয়ার নাম পৃথকীকরণ এবং পরে সেই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভিত্তি করে কোন সামান্যধর্মী সূত্র তৈরী করার নাম সামান্যীকরণ। শিখন পরিস্থিতি থেকে যখন শিক্ষার্থী পৃথকীকরণ ও সামান্যীকরণের সাহায্যে অন্তর্নিহিত সাধারণ সূত্রগুলি উপলব্ধি করতে পারে তখনই অন্তর্দৃষ্টি জাগে এবং শিখন সংঘটিত হয়।

গেস্টাল্টবাদীদের মতে শিখন প্রক্রিয়া কতকগুলি সোপানের মধ্যে দিয়ে সংঘটিত হয়। সেগুলি হল এই–

প্রথমত, শিক্ষার্থী সমস্যাটির সম্পূর্ণ পরিস্থিতিটি সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষণ করে।

দ্বিতীয়ত, সমগ্র সমস্যাটির উদ্দেশ্যে সে সমগ্রভাবে প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করে।

তৃতীয়ত, সমস্যাটির অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সে একটি সংগঠন তৈরী করে এবং তার জন্য তাকে পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে হয়। এই পর্যায়ে শিক্ষার্থী নিজে, তার লক্ষ্য এবং এ-দুয়ের অন্তবর্তী বাধা-এ তিনটি বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে।

চতুর্থত, সমস্যাটি বা বিষয়টির অন্তর্নিহিত মৌলিক তত্ত্ব বা সূত্রটি শিক্ষার্থী পৃথকীকরণ

এবং সামান্যীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে উপলব্ধি করে। এই ধাপেই সমস্যার সমাধানটি শিক্ষার্থীর মনে বিদ্যুৎ চমকের মত দেখা দেয় এবং একেই গেস্টাল্টবাদীরা অন্তর্দৃষ্টি বলে বর্ণনা করেছেন। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, গেস্টাল্টবাদীরা সার্থক শিখনের জন্য প্রত্যক্ষণ, সম্পর্কনির্ণয়, সংগঠন, পৃথকীকরণ ও সামান্যীকরণ এ কয়টি প্রক্রিয়ার উপরই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

শিক্ষায় গেস্টাল্টতত্ত্বের প্রয়োগ

টিপ্পনী

গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের দেওয়া শিখনের এই নতুন ব্যাখ্যা আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশেষ করে বিদ্যালয়ে প্রচলিত শিখন পদ্ধতির সংস্কারসাধন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে আজকাল গেস্টাল্ট মতবাদের মৌলিক তত্ত্বটি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। নীচে শিক্ষায় গেস্টাল্ট মতবাদের প্রয়োগের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

প্রথমত, স্কুল-কলেজের শিক্ষাব্যবস্থায় এতদিন অনুসৃত বিশ্লেষক বা অংশমূলক পদ্ধতির স্থানে সংশ্লেষক বা সমগ্র পদ্ধতির ব্যপক প্রচলন শুরু হয়েছে। আগে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুটিকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে শিক্ষার্থীকে ঐ অংশগুলি পৃথকভাবে শেখানোর প্রথা প্রচলিত ছিল। এরই নাম ছিল বিশ্লেষক পদ্ধতি। এতে শিক্ষার্থী বিষয়বস্তুর সমগ্র রূপটি দেখতে পেত না এবং তার প্রচেষ্টা হত সম্পূর্ণ শিক্ষক পরিচালিত, অন্ধ ও যান্ত্রিক। উদাহরণস্বরূপ, বলা যেতে পারে যে শিক্ষার্থীকে বীজগণিতের সম্পূর্ণ একটি সমস্যার সমাধান করতে না দিয়ে প্রথমেই কতকগুলি ফরমূলা তাকে শেখানো হত। ফরমূলাগুলি যেহেতু সমগ্র সমস্যাটির কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়, সেহেতু সেগুলি শিক্ষার্থীর কাছে অর্থহীন এবং অবাস্তব বস্তু বলে মনে হত। আধুনিক সংশ্লেষক বা সমগ্র পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সামনে আগে সম্পূর্ণ সমস্যাটি তুলে ধরা হয় এবং তারপর সেই সমস্যাটি বিশ্লেষণ করার সময় প্রয়োজনীয় ফরমূলাগুলি শেখানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ, আগে বিশ্লেষণ থেকে যাওয়া হত সংশ্লেষণে। আজকাল সংশ্লেষণ থেকে যাওয়া হয় বিশ্লেষণে, তারপর আবার সংশ্লেষণে। অর্থাৎ সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণ-পুনঃসংশ্লেষণ, এই হল আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতির অনুক্রম। আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতিতে ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, সমাজবিজ্ঞান, গণিত-এ সবই শেখানোর সময় প্রথমে পাঠ্যবস্তুটির একটি সমগ্র রূপ শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরা হয় এবং পরে সেটিকে ছোট ছোট অংশে বিশ্লেষণ করে প্রতিটি অংশের ব্যাখ্যা করা হয়। সব শেষে সেই বিভিন্ন অংশগুলিকে সংযুক্ত করে বিষয়বস্তুটির সামগ্রিক রূপটি তার সামনে আবার উপস্থাপিত করা হয়। আধুনিক যুগের শিক্ষণ পদ্ধতির এই আমূল পরিবর্তনের মূলে আছে গেস্টাল্টবাদীদের প্রদত্ত শিখন প্রক্রিয়ার এই নতুন সংব্যাখ্যানটি।

দ্বিতীয়ত, গেস্টাল্ট মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষা আসে অন্তর্দৃষ্টি থেকে। অন্তর্দৃষ্টি দেখা দেয় সমস্যার বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্পর্কের উপলব্ধি থেকে। অতএব শিক্ষার্থীর মধ্যে এই সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষমতা যাতে ভালভাবে বিকশিত হয় সেটি সর্বাগ্রে দেখতে হবে। তার জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রদত্ত সমস্যাটির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অনুসন্ধানের অভ্যাস সৃষ্টি করতে হবে এবং তাকে এই সম্পর্ক নির্ণয়ের কৌশল আয়ত্ত করতে সাহায্য করে শিক্ষক তার শিখনকে সহজ ও দ্রুত করে তুলবেন।

তৃতীয়ত, গেস্টাল্টবাদীদের মতে সম্পর্ক নির্ণয় ছাড়াও পৃথকীকরণ ও সামান্যীকরণ প্রক্রিয়া দুটি অন্তর্দৃষ্টির জাগরণের জন্য একান্ত প্রয়োজন। পৃথকীকরণের অর্থ হল শিক্ষার বিষয়বস্তুর

অন্তর্গত অপ্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে প্রাসঙ্গিক এবং সাধারণধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলিকে পৃথক করে নেওয়া এবং সামান্যীকরণের অর্থ হল সেই পৃথকীকৃত বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভিত্তি করে সামান্য বা সার্বজনীন তত্ত্ব বা সূত্র গঠন করা। অতএব শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে কার্যকর করে তুলতে হলে শিক্ষার্থীকে এই অত্যাবশ্যক মানসিক প্রক্রিয়া দুটি সম্পন্ন করতে শেখাতে হবে।

চতুর্থত, শিক্ষাদানের সময় মনে রাখতে হবে যে অন্ধ বা যান্ত্রিক প্রচেষ্টা থেকে শিখন হয় না। শিখন হল অন্তর্দৃষ্টি থেকে সঞ্জাত এক ধরনের মানসিক উপলব্ধি বিশেষ। অতএব শিক্ষার্থী যাতে অনর্থক অন্ধ বা যান্ত্রিক প্রচেষ্টা করে উদ্যম ও সময় নষ্ট না করে সেদিকে শিক্ষকের সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

টিপ্পনী

পঞ্চমত, শিখনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর মধ্যে পূর্ণ সচেতনতা থাকবে। অতএব শিখনের পরিস্থিতিটি যেন শিক্ষার্থীর কাছে উন্মুক্ত থাকে যাতে সে তার শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার ধারণা গঠন করতে পারে।

ষষ্ঠত, শিখন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি যেন শিক্ষার্থীর বোধশক্তি ও গ্রহণ ক্ষমতার সঙ্গে সুষমভাবে সংহতিসম্পন্ন থাকে। শিখনের সাফল্য নির্ভর করে সমস্যার বিভিন্ন অংশগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক উপলব্ধির উপর। অতএব শিখনের প্রক্রিয়াটি এমন গতিতে সংঘটিত হবে যাতে শিক্ষার্থীর পক্ষে এই সম্পর্কগুলি উপলব্ধি করা সম্ভব হয় এবং তার মধ্যে অন্তর্দৃষ্টির জাগরণ সহজ হয়ে ওঠে।

অবশেষে আসে শিক্ষার্থীর অনুভূতিমূলক ও জ্ঞানমূলক প্রস্তুতি। প্রথমত, শিক্ষার্থী যেন শিক্ষণীয় বস্তুটি গ্রহণের জন্য তার নিজের পূর্বার্জিত জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রস্তুত থাকে অর্থাৎ শিক্ষণীয় বস্তুটি শেখার মত যথেষ্ট পূর্বজ্ঞান যেন তার মধ্যে থাকে। দ্বিতীয়ত, অনুভূতি বা প্রক্ষোভের দিক দিয়েও সে যেন শিক্ষাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে। শিক্ষার্থীর প্রক্ষোভ যদি শিক্ষার প্রতিকূল হয় তবে তার শিখন বিলম্বিত বা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিখনের সকল পরিস্থিতিতেই শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া সব সময় সামগ্রিক ধরনের হয়ে থাকে এবং সে যে প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করে তা সে তার সামগ্রিক অস্তিত্ব বা সত্তা দিয়ে। অতএব সুষ্ঠু শিখনের জন্য তার দেহমনের সর্বাঙ্গীন প্রস্তুতি অবশ্য প্রয়োজন।

টিপ্পনী

একক - ৪ শিখন (Learning) ঃ

শিখনের সঞ্চালন (Transfer of Learning) ঃ

ব্যক্তি জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ হল শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। ব্যক্তিজীবনের এই বিকাশ যেমন অনেকাংশে স্বাভাবিক পরিনমন (Maturation) এর দ্বারা হয়ে থাকে তেমনি প্রশিক্ষণের মাধ্যমেও হয়। মানুষের জীবনের বিকাশের ধারা অনুশীলন করলে দেখা যায় প্রত্যেক মানুষই একটা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। কী বৃহত্তর সমাজ পরিবেশে কী গৃহ পরিবেশে কী গৃহ পরিবেশে আর কী বিদ্যালয়ের পরিবেশে সর্বএই একই প্রচেষ্টা চলছে। এই প্রচেষ্টার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য হল মনের প্রশিক্ষণ আর পরোক্ষ উদ্দেশ্য হল ব্যক্তি জীবনের বিকাশের মাধ্যমে সমাজ জীবনের উন্নতি সাধন।

টিপ্পনী

দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে অমরা দেখতে পাই শিখনের সঞ্চালন কিছু পরিমাণে হলেও তার স্বরূপ মানসিক শক্তিবাদীগণ (Experts of faculty of psychology) যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা গ্রহন যোগ্য নয়। মনোবিদ Garrett এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন য়ে সীমাহীন সঞ্চালন কোনো সময়েই সম্ভব নয়। উকিল কে বিচারকের কাজ দিলে সে হয়তো করতে পারে কিন্তু ইঞ্জিজনীয়র কে দিয়ে ডাক্তারী করানো সম্ভব নয় তাছাড়া শৃঙ্খলা বাদে বিশ্বাসী মনোবিদগন সঠিক করে বলতে পারেননি আসলে মানুষের কতকগুলি শক্তি আছে। এই সব কারনেই মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্বকে বর্তমানে অন্তত তাত্ত্বিক দিক থেকে ত্যাগ করা হয়েছে। তবে ব্যবহারিক দিকে থেকে এই তত্ত্ব আজও কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরোক্ষ ভাবে আমাদের প্রভাবিত করছে তার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন মনোবিদ Du Bois ও তাঁর সহযোগীরা মনে করেন যে আধুনিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের প্রভাব কোনো না কোনো ভাবে এসে যায়।

আধুনিক মনোবিজ্ঞান শিখন সঞ্চালনকে অন্য বগিতে বিচার করেছেন। পুরাতন মতবাদ অনুযায়ী কোনো বিশেষ বিষয়ের অনুশীলনের ফলে মনের কতকগুলি শক্তির উৎকর্ষণ হয় এবং তার দ্বারা আমরা অন্য যে কোনো সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হই। শিখন সঞ্চালনের ব্যাখ্যা আমরা এক বিষয়ের শিক্ষা অন্য বিষয়ে কী ভাবে স্থান গুরিত হয় যে সম্পর্ক অবহিত হই। এক পরিস্থিতির শিখন লব্ধ অভিজ্ঞতাকে যখন শিক্ষাক্ষেত্রে অন্য স্থানে পরিবর্তন করা হয় তখন সেই ঘঠনাকে বলা হয় শিখন সঞ্চালন শিখন সঞ্চালন আলোচনা করতে গিয়ে কতকগুলো সমস্যা দেখা দেয়।

সে গুলি হল-

ক) শিখন সঞ্চালন হয় কী না হলেও তা কী পরিমানে হয় তা বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা।

খ) শিখন সঞ্চালন কেন হয় বা কী ভাবে শিখনের সঞ্চালন হয়।

গ) কী ভাবে শিখন সঞ্চালনের পরিমান কে বাড়িয়ে তোলা যায়। অর্থাৎ বিদ্যালয় পরিস্থিতি থেকে কী ভাবে অভিজ্ঞতা কে জীবন পরিস্থিতিতে বেশী পরিমানে সঞ্চারিত করা যয়। এক

কথায় বলা যায় আধুনিক শিখন সঞ্চালন মতবাদের মূল উদ্দশ্য হল সঞ্চালনের প্রকৃতি অনুশীলন করা। এবং সঞ্চালনের জ্ঞান কে সার্থক ভাবে মানুষের শিখনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা।

শিখন সঞ্চালন সংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষা বিশ্লেষন করলে আমরা দেখতে পাই সঞ্চালনের প্রকৃতি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রকমের হয়। শিখন সঞ্চালনের এই প্রকৃতি অনুশীলন করে মনো বিদ গন সঞ্চালনকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এই শ্রেণী বিভাগের ভিত্তি দ্বিমুখী প্রথমত শিখন সঞ্চালনকে তার গতি বা অভিমুখীতা র ভিত্তিতে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন- ১)ধনাত্মক সঞ্চালন ২) শূন্য সঞ্চালন এবং ৩) ঋনাত্মক সঞ্চালন। এছাড়া মনোবিদ্‌গন স্তর ভেদ এর সঞ্চালন কে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন- ক) আরম্ভিক সঞ্চালন যখন কোনো বিষয় কেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা সেই বিষয় শিখনের ক্ষেত্রে উন্নত স্তরে সঞ্চালিত হয় তখন তাকে বলা হয় আরম্ভিক সঞ্চালন উদাহরণ স্বরুপ গণিতের যোগের অভিজ্ঞতা গুন অঙ্ক সমাধানের ক্ষেত্রে সঞ্চালিত হয়। খ) অনুভূমিক সঞ্চালন যখন বিষয়ের শিখন লব্ধ অভিজ্ঞতা সমকঠিন্য মান সম্পন্ন অন্য কোনো বিষয় শিখনের ক্ষেত্রে সঞ্চালিত হয় তখন তাকে বলা হয় অনুভূমিক সঞ্চালন। যেমন ,গণিতের জ্ঞান, বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব অনুধাবনে সঞ্চালিত করাহয়। গ) রৈখিক সঞ্চালন যখন কোনো বিষয় বস্তু শিখনের অভিজ্ঞতা সেই সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করা হয় তখনতাকে বলা হয় রৈখিক সঞ্চালন। যেমন গণিতে ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত জ্ঞান জমি পরিমাপ করার ক্ষেত্রে সঞ্চালিত করা হয়। এই তিন ধরনের সঞ্চালন ছাড়া আর এক বিশেষ ধরনের সঞ্চালনের কথা মনোবিদ্‌গন বলেছেন। একে বলা হয় দ্বি মুখী সঞ্চালন। এখানে দেহের এ অঙ্গে শিখন লব্ধ অভিজ্ঞতা দেহের অপর অংশে অবস্থিত অঙ্গে সঞ্চালিত হয়ে থাকে।

শিখন সঞ্চালন সম্পর্কে বিভিন্ন পরীক্ষনের দ্বারা মনোবিদ গন মানসিক শৃঙ্খলা তত্ত্বের ওপর তাদের অনাস্থাকে বৈজ্ঞনিরা বিশ্লেষণ প্রমানিত করেছেন। কিন্তু এই সমস্ত পরীক্ষনের মাধ্যমে মনোবিদগনের যে শুধুমাত্র মানসিক শৃঙ্খলা তত্ত্বকে ভুল প্রমান করার উদ্দেশ্য ছিল তা কিন্তু নয় তার পরিবের্তে ভিন্ন কোনো মতবাদ গড়ে তোলা যায় কী না সে চেষ্টা ও অনেকের ছিল। কেন শিখন অভিজ্ঞতার সঞ্চালন হয় তা সঠিখ ভাবে নির্নয়করতে না পারলে তাকে সার্থক ভাবে মানুষের শিক্ষার কাজে প্রয়োগ করা যাবে না।এই জন্য বর্তমান কালে মনোবিদগনের কাছে যেটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তা হল কেন সঞ্চালন হয়? আশ্চর্যের ব্যাপার বিভিন্ন মনোবিদ মানসিক শৃঙ্খলা তত্ত্বের বিরুদ্ধে একত্রিত হলেও নতুন মতবাদ গঠনে তাঁরা একমত হতে পারেননি। এর ফলে বিভিন্ন মনোবিদ শিখন সঞ্চালনের বিভিন্ন তত্ত্ব প্রচার করেন এর মধ্যে তিনটি উল্লেখযোগ্য অভিন্ন উপাদানের তত্ত্ব ২ সামান্যীকরনের তত্ত্ব এবং সমগ্রতাবাদ

সমগ্রতাবাদী গন অভিন্ন উপাদানের তত্ত্ব বা সামমান্যীকরনেরতত্ত্ব কোনো দিকেই সম্পূর্ণরুপে অস্বীকার করেননি।কিন্তু বলেছেন দুটো পরিস্থিতির মধ্যে অভিন্ন উপাদান থাকলেও তা উপলব্ধি করার দরকার বা অভিজ্ঞতার সামান্যীকরনের জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন তাই তাঁদের মতে সঞ্চালন নির্ভর করে নতুন এবং পুরোনো পরিস্থিতিতে অংশগ্রহন ও সমগ্রের মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক স্থাপনের ওপর এবং সেই সম্পর্ক ব্যক্তির কী ভাবে প্রত্যক্ষ করছে তার ওপর শিখন সঞ্চালনের সমস্যা শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূলে যে নীতি কাজ করছে তা হল শিখন সঞ্চালনের নীতি। বিদ্যালয়ের শিক্ষা যদি শিক্ষার্থীরা বৃহত্তর জীবন পরিবেশে সঞ্চালিত না করতে পারে তাহলে সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষা তার নিজস্ব তাৎপর্য হারাবে। এই কারনে ভবিষৎ নাগরিক প্রশিক্ষনের ক্ষেত্রে শিখন সঞ্চালনের মূলকে অস্বীকার

টিপ্পনী

করা যায় না। বরং শিখন সঞ্চালনের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান না করতে পারলে শিক্ষার কোনো মূল্য থাকে না। সঞ্চালনের যে গুরুত্ব রয়েছে তা বিবেচনা করলে বলতে হয় এই প্রক্রিয়া ব্যক্তিজীবনে সংরক্ষণ এবং বিস্তৃতি উভয় ধর্মকে সজীবকরে তোলে।

শিখন সঞ্চালনেরএই গুরুত্বের জন্যই এই নীতিকে শিক্ষনের ক্ষেত্রে সার্থক ভাবে প্রয়োগ করতে হবে। বিভিন্ন পরীক্ষা লব্ধ ফল থেকে দেখা গেছে এক অবস্থার শিখন অন্য অবস্থায় সঞ্চালিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন শিক্ষাবিদ প্রশ্ন করেছেন কী ভাবে এই সঞ্চালন কে বেশী করাযায়? কী ধরনের শিক্ষন পদ্ধতি সবচেয়ে বেশী কিসের সঞ্চালন আমরা করতে চাই এবং কোথায় করতে চাই ? এরকম নানা প্রশ্ন শিক্ষাবিদ গনের সামনে এসেছে। সঞ্চালন যে বিভিন্ন বিষয়ের হয় তাতে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু কী ভাবে তা আনা যাবে তা নির্ভর করছে শিক্ষাবিদ্গনের দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর । প্রাচীন শৃঙ্খলা বাদের ওপর ভিত্তি করে আমরা যদি শিক্ষন পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রন করি এবং বিদ্যা লয়ে কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের মাধ্যমে চারিত্রিক বিকাশের চেষ্টা করি তাহলে ঐ অবৈজ্ঞনিক প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। সেই জন্য শিখন সঞ্চালনের নীতিকে শিক্ষাক্ষেত্রে সার্থক ভাবে প্রয়োগ করতে হলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। সংস্কার মুক্ত মননিয়ে এই সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তবেই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য চরিতার্থহবে।

টিপ্পনী

শিখনের সঙ্গে জড়িত উপাদান সমূহ (Factors associated with learning)

শিখন এখন এক জটিল প্রক্রিয়া যা কে কোনো একটি মাত্র সংজ্ঞা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই শিখনকে সঠিক ভাবে বুঝতে গেলে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত উপাদান গুলিজানতে হবে।

১. শিখন ও পরিবেশ

শিখনের সংজ্ঞা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি পরিবর্তন শীল পরিবেশের মধ্যে ব্যক্তি জীবনের সাম্য রাখার জন্যই শিখনের প্রয়োজন অর্থাৎ আমরা বলতে পারি বাইরের জগতের তাগিদ থাকলেই শিখন হয়। পরিবেশ যদি স্থবির হত তাহলে আমাদের নতুন আচরণ করার প্রয়োজন হত না আর শিখন ও প্রয়োজন হত না। আর শিখন ও প্রয়োজন হত না। তাই শিখন প্রক্রিয়ার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে বাইরের জগতের বা পরিবেশের তাগিদেই অনেক সময় এই প্রক্রিয়া শুরু হয়। তাই শিখনের একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল পরিবেশ।

২. শিখন ও আত্মসক্রিয়তা

আবার যখন কোনো শিখন বাইরের বা পরিবেশের তাগিদে একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে তখন ঐ প্রক্রিয়া ব্যক্তির মধ্যে সংঘটিত হয়। অথীত অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষনের ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তি আত্মপ্রচেষ্টায় এই পরিবর্তন সাধন করে। পরিবর্তিত পরিবেশে ব্যক্তি কী ভাবে আচরণ করবে তা সে নিজেই ঠিক করে। সুতরাং শিখন প্রক্রিয়া ব্যক্তির আত্মসক্রিয়তা জাগিয়ে তোলে এবং এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৩. শিখন ও প্রেষণা

প্রেষণা ব্যক্তির কাজের শক্তি যোগায়। মানুষের অভ্যন্তরীন উদ্যম জাগরিত হয় এই প্রেষনার মাধ্যমে। ব্যক্তির মধ্যে উদ্যম সৃষ্টির জন্য শাস্তি প্রশংসা নিন্দা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এগুলো শিক্ষার্থী দের স্থায়ী ভাবে উদ্যম সৃষ্টি করতে পারে না। শিক্ষনীয় বিষয়কে যদি বিভিন্ন উপায়ে আকর্ষনীয় করে তোলা যায় তবে তা শিক্ষার্থীদের স্থায়ী প্রেষণা তৈরী করে ছাত্র শিখনের ওপর প্রেষনার অপরীসীম প্রভাব রয়েছে। প্রেষনার অভাবে কোনো শিখন নাও হতে পারে। আবার অল্প শিখনও হতে পারে এর ফলে শিখনের মাধ্যমে যা আয়ত্ব করা হয়েছে তা খুব তাড়াতাড়ি ভলে যাওয়া হয়। পক্ষান্তরে পর্যাপ্ত প্রেষণা শিখন চলা কালীন শক্তির সঞ্চার করে থাকে। কোনো কিছু শেখার জন্য একজন ছাত্র শিক্ষার্থী যত প্রেষিত হয় ততই সে শিখন প্রক্রিয়া কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সপ্তাহ মাস এবং বছর ভর কোনো ছাত্র এই প্রেষনার জন্যই অধ্যয়ন করতে সমর্থ্য হয়। কী ভাবে সাইকেল চড়া শিখতে হয় এটা যদি কোনো বালক মনে প্রানে চায় তাহলে তার ক্রিয়া কলাপে প্রেষণার একটা অদ্ভুত ছোঁয়া দেখতে পাই। গভীর মনোযোগ সহকারে বালকটি সাইকেল চড়া শিখতে শুরু করে এবং তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। অনেকবার সে অকৃত কার্ন হয় সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে ক্ষত বিক্ষত হয় কিন্তু সাইকেল চড়া থেকে সে প্রতিনিবৃত্ত হয় না।

টিপ্পনী

শিখনের সঙ্গে প্রেষণার সম্পর্কও অবিচ্ছেদ্য। বিনা প্রেষণায় কোন শিখন হতে পারে না। ছোটই হোক্ বা বড়ই হোক্ সব শিখনই জন্মায় প্রাণীর প্রচেষ্টা থেকে, আর প্রচেষ্টামাত্রেই সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন হয় একটা অভ্যন্তরীণ শক্তি বা উদ্যম। এই অভ্যন্তরীণ শক্তি বা উদ্যমকে আমরা প্রেষণা নাম দিতে পারি। প্রেষণা কোন বাইরের বস্তু নয় বা শিক্ষার্থীকে শিখতে বাধ্য করার জন্য তার মধে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। প্রেষণা ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ বস্তু এবং শিখনমাত্রেই অপরিহার্য উপকরণ।

প্রেষণাকে আমরা ব্যক্তির একটি বিশেষ অভ্যন্তরীন অবস্থা বলে বর্ণনা করতে পারি। প্রেষণা দু'শ্রেণীর হতে পারে মানসিক ও শরীরতত্ত্বমূলক। ব্যক্তির মধ্যে এই বিশেষ অভ্যন্তরীণ অবস্থাটি যখন দেখা দেয় তখন তার মধ্যে একটি উত্তেজনা জাগে এবং যতক্ষণ না তার সেই উত্তেজনা দূর হয় ততক্ষণই সেই উত্তেজনা ব্যক্তিকে একটি বিশেষ পথে নিয়ে যায় এবং বিশেষভাবে আচরণ করতে তাকে বাধ্য করে। সাধারণত স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যক্তির মধ্যে সব দিক দিয়ে একটা শান্ত সমতাপূর্ণ অবস্থা থাকে। তাকে সাম্যাবস্থা বলা হয়। যখন ব্যক্তির মধ্যে কোন প্রেষণা জাগে তখন তার এই অভ্যন্তরীণ সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়ে যায় এবং তার মধ্যে দেখা দেয় একটি অস্বস্তিকর ও উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থা। ব্যক্তি তখন প্রেষণার তৃপ্তির দ্বারা তার সেই লুপ্ত সাম্যাবস্থা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে। ম্যাক্‌গেওকের ভাষায় 'প্রেষণা হল ব্যক্তির এমন একটি অবস্থা যা বিশেষ একটি কাজের অনুশীলনের দিকে ব্যক্তিকে পরিচালিত করে বা তাকে কাজটির সঙ্গে পরিচিত করে এবং যা ব্যক্তির বিভিন্ন আচরণের পর্যাপ্ততার এবং কাজটির সম্পাদনের একটা সংজ্ঞা দান করে।' অতএব দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তির সমস্ত আচরণের পেছনেই অপরিহার্যভাবে আছে এই প্রেষণার ভূমিকা।

শিখন ও উদ্‌বোধক

কেবলমাত্র প্রেষণা থাকলেই আবার শিখন হয় না। প্রেষণার সঙ্গে আর একটি বস্তুর থাকা একান্ত প্রয়োজন। সেটি হল উদ্‌বোধক। উদ্‌বোধক হল সেই বস্তু বা অবস্থা যা পেলে বা যেখানে পৌঁছতে পারলে প্রেষণার তৃপ্তি ঘটে। প্রকৃতপক্ষে এই দুটি বস্তু যখন একসঙ্গে মিলিত হয় তখনই শিখন ঘটতে পারে, নইলে নয়। এইজন্য বলা হয় যে শিখন সম্ভব হয় একমাত্র 'প্রেষণা-উদ্‌বোধকের মিলিত পরিস্থিতিতেই।'

টিপ্পনী

আভ্যন্তরীণ উদ্‌বোধক

শিখনের বিষয়বস্তু যখন শিক্ষার্থীর নিকট অর্থপূর্ণ বলে মনে হয় তখন শিক্ষার্থী সেটি শেখার জন্য স্বাভাবিক প্রেষণা বোধ করে। সেই বস্তুটি শেখার জন্য সে নিজে থেকেই প্রচেষ্টা করে এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই সেটি শেখে। এ ক্ষেত্রে কোন বাহ্যিক বস্তুর সাহায্যে তার মধ্যে প্রেষণা জাগানোর প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ এখানে শিক্ষণীয় বস্তুটি নিজেই শিক্ষার্থীর কাছে উদ্‌বোধক রূপে কাজ করে। একেই বলে অভ্যন্তরীণ উদ্‌বোধক।

অভ্যন্তরীণ প্রেষণার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে সে ক্ষেত্রে শিক্ষণীয় বস্তুটিই হল একমাত্র উদ্‌বোধক এবং শিক্ষণীয় বস্তুটির জন্য শিক্ষার্থীর চাহিদাও স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে থাকে।

বাহ্যিক উদ্‌বোধক

কিন্তু নানা কারণেই দেখা যায় যে প্রায়ই শিক্ষার্থীর মধ্যে এই অভ্যন্তরীণ প্রেষণার অভাব রয়েছে। অর্থাৎ তখন সে শিক্ষনীয় বস্তুটি শেখার জন্য কোন স্বাভাবিক চাহিদা বোধ করে না। ফলে তাকে শিক্ষাদানের জন্য নানারূপ বাহ্যিক উদ্‌বোধকের সাহায্য নিতে হয়। প্রচলিত ও বহুল ব্যবহৃত এই ধরনের কয়েকটি বাহ্যিক উদ্‌বোধনের বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

নিন্দা ও প্রশংসা ঃ এই বাহ্যিক উদ্‌বোধক দুটির সাহায্যে শিক্ষার্থীকে শিখতে প্ররোচিত করার পন্থা অতি প্রাচীন ও সর্বদেশেই প্রচলিত। শিক্ষক ও অন্যান্য বয়ঃপ্রাপ্তদের প্রশংসা পাওয়া ও তাঁদের নিন্দা এড়ানোর জন্য শিক্ষার্থী নিজে ইচ্ছা অনুভব না করলেও চাপে পড়ে বা বাধ্য হয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে।

শাস্তি ও পুরস্কার ঃ এই উদ্‌বোধক দুটি নিন্দা ও প্রশংসারই মূর্তরূপ। এদের ব্যবহারও বহু প্রাচীন ও সর্বজনীন। তবে আধুনিক ব্যাপক গবেষণায় দেখা গেছে যে শাস্তির চেয়ে প্রশংসা বেশী কার্যকর।

প্রতিযোগিতা ঃ অন্যান্য সঙ্গীদের প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেবার স্পৃহা শিক্ষার্থীর মধ্যে শিখনের প্রেষণা সৃষ্টি করে এবং বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই প্রতিযোগিতার চাপে শিক্ষার্থী নতুন কিছু শিখতে অনুপ্রাণিত হয়। এই উদ্‌বোধকটি কিন্তু স্বাস্থ্যকর সামাজিক পরিবেশ গঠনের বিরাট প্রতিবন্ধক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে হিংসা, রাগ, ঘৃণা প্রভৃতি অবাঞ্ছনীয় মনোভাবের সৃষ্টি করে।

সাফল্য সম্বন্ধে সচেতনতা ঃ নিজের সাফল্য সম্বন্ধে সচেতনতাও অনেক ক্ষেত্রে শিখনের উদ্‌বোধকরূপে কাজ করে থাকে। বহু গবেষণা থেকেও দেখা যায় যে শিক্ষার্থী যতই নিজের

সাফল্য সম্বন্ধে সচেতন হয় ততই তার শিক্ষায় আগ্রহ বেড়ে যায়।

এছাড়া সামাজিক সমর্থন, আত্মস্বীকৃতি, আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি লাভের চাহিদা, নতুন কিছু সৃষ্টি করার আগ্রহ, জয় করার স্পৃহা এমন কি যৌন বা বাৎসল্যের অনুভূতিও অনেক সময় শিখনের উদ্‌বোধকরূপে কাজ করে থাকে।

টিপ্পনী

অসংখ্য গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে বাহ্যিক প্রেষণা সকল সময় কার্যকর হয় না এবং তা থেকে প্রসূত শিক্ষা প্রায়ই যান্ত্রিক ও ত্রুটিপূর্ণ হয়। বিশেষ করে নিন্দা-প্রশংসা, শাস্তি-পুরস্কার, প্রতিযোগিতা প্রভৃতি উদ্‌বোধকগুলি সন্তোষজনক শিখনের পক্ষে মোটেই সহায়ক নয়। একমাত্র অভ্যন্তরীণ প্রেষণাই অর্থাৎ শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ ও শিক্ষনীয় বস্তুর প্রতি চাহিদাই শিখনকে সম্পূর্ণ ও সার্থক করে তুলতে পারে। এইজন্যই আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থায় সকল প্রকার বাহ্যিক উদ্‌বোধককে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং শিক্ষার্থীকে তার স্বাভাবিক আগ্রহ ও প্রেষণার সাহায্যে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

শিক্ষায় প্রেষণার ত্রিবিধ কাজ

শিখনের ক্ষেত্রে প্রেষণার কাজকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা-

১। প্রেষণা আচরণের পিছনে উদ্যম বা শক্তি যোগায়।

২। প্রেষণা ব্যক্তির আচরণ প্রবণতার নির্বাচন বা নির্ধারণ করে।

৩। প্রেষণা ব্যক্তির আচরণের গতিপথ নির্ণয় করে।

প্রত্যেক আচরণের সম্পাদনেই প্রয়োজন উদ্যম বা শক্তি। প্রেষণার প্রথম কাজ হল ব্যক্তির অভ্যন্তরস্থ উদ্যমকে জাগানো এবং পরিবেশের উপযোগী আচরণ সৃষ্টি করা। ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি জৈবিক প্রেষণা শরীরের অভ্যন্তরস্থ মাংসপেশী, গ্রন্থি প্রভৃতিকে সক্রিয় করে তোলে এবং ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় আচরণটি সম্পন্ন করতে প্রবুদ্ধ করে।

বিভিন্ন বাহ্যিক উদ্দীপক ব্যক্তির ক্ষেত্রে উদ্‌বোধকরূপে কাজ করে এবং তার অভ্যন্তরস্থ প্রেষণার সঙ্গে মিলিত হয়ে তাকে কাজে প্রবৃত্ত করে এবং কাজের প্রকৃতি নির্ধারিত করে। বিশেষ করে প্রশংসা, নিন্দা, ভৎর্সনা, পুরস্কার, শাস্তি, অর্থ, খাদ্য ইত্যাদি হল এমন কয়েকটি উদ্‌বোধক যা সব সমাজে ব্যবহৃত হয় ব্যক্তির মধ্যে প্রেষণা উদ্বুদ্ধ করার জন্য। অবশ্য ব্যক্তি কতটা এই সব উদ্‌বোধকের দ্বারা প্রভাবিত হবে তা অনেকখানি নির্ভর করে ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা, বিচারকরণ, প্রত্যাশা, অনুমান প্রভৃতির উপর।

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মধ্যে এই উদ্যম সৃষ্টি করাটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ। শিক্ষায় স্বাভাবিক প্রেষণার অভাব দেখলে প্রায়ই পুরস্কার, শাস্তি, প্রশংসা, নিন্দা ইত্যাদি নানা শক্তিশালী উদ্‌বোধকের সাহায্য নেওয়া হয়। মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে এটি সম্পূর্ণ ভুল শিক্ষা নীতি। এই সব উদ্‌বোধক দ্বারা সাময়িকভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্যম সৃষ্টি করা গেলেও সেই উদ্যম কখনো স্থায়ী হয় না। কিন্তু অপরপক্ষে যদি শিক্ষনীয় বস্তুটিকে শিক্ষার্থীর কাছে সত্যকারের আকর্ষণীয় করে তোলা যায় তাহলে সেই বস্তুটি তার কাছে উদ্‌বোধকরূপে কাজ করবে এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে স্থায়ী প্রেষণার সৃষ্টি করবে। শিক্ষনীয় বস্তুটিকে আকর্ষণীয় করে তোলার পন্থা

হল বস্তুটির অর্থ ও সার্থকতা সম্বন্ধে শিক্ষার্থী যাতে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। সাধারণত স্কুলে পরীক্ষায় পাশ-মার্ক পাওয়া, প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি উন্নত স্থান অধিকার করা, পুরস্কার, বৃত্তি পাওয়া প্রভৃতি উদ্‌বোধকগুলির দ্বারা শিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এগুলির দ্বারা বাস্তবক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রচেষ্টার সৃষ্টি করা যায় বটে কিন্তু প্রকৃত শিক্ষণীয় বস্তুটি বা কাজটি যদি শিক্ষার্থীর কাছে আকর্ষণীয় বা সার্থকতা সম্পন্ন বলে মনে না হয় তাহলে শিক্ষার্থীর সে শিক্ষা সত্যকারের কার্যকর হয় না। গতানুগতিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীর সামনে প্রকৃত লক্ষ্যটি (অর্থাৎ শিক্ষনীয় বস্তু বা কাজটি) উপস্থিত না করে পরীক্ষায় উচ্চ নম্বর পাওয়া, শ্রেণীতে উচ্চ স্থান অধিকার করা, পুরস্কার পাওয়া ইত্যাদি নানা কৃত্রিম লক্ষ্য স্থাপন করা হয় এবং তার ফলে সেসব বিদ্যালয়ের শিক্ষা যান্ত্রিক ও অসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

টিপ্পনী

প্রেষণার দ্বিতীয় কাজ হল আমাদের আচরণ প্রবণতার নির্বাচন ও নিয়ন্ত্রণ করা। প্রেষণাই আমাদের নির্দেশ দেয় যে কোথায় এবং কখন আমরা সাড়া দেব আর কোথায় কখন আমারা সাড়া দেব না। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কিভাবে সাড়া দেওয়া উচিত তাও নির্ধারিত করে দেয় আমাদের প্রেষণা। এর অর্থ হল যে যখনই আমাদের মধ্যে কোন একটি বিশেষ প্রেষণার সৃষ্টি হয় তখনই কেবল যে আমরা সেই অভ্যন্তরীণ উত্তেজনামূলক পরিস্থিতির চাপে সক্রিয় হয়ে উঠি তাই নয়, আমরা যে সব কাজ সে সময় সম্পন্ন করি সেগুলিও আমাদের কাছে বিশেষভাবে নির্বাচিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠে। আমাদের কর্মপ্রবণতার এই নির্বাচন ও নিয়ন্ত্রণের পেছনে আছে আমাদের এই বিশেষ প্রেষণাটি।

মানব আচরণের প্রকৃতি হল নির্বাচনধর্মী। অর্থাৎ আমরা যে সব আচরণ করি সেগুলি আগে থেকেই সুনির্বাচিত থাকে। বিশেষ লোক যখন একই খবরের কাগজ পড়ে তখন তারা প্রত্যেকেই প্রকৃতপক্ষে কাগজের বিভিন্ন অংশ পড়ে। বিভিন্ন লোক যখন একটা সিনেমার ছবি দেখে বা একটি দৃশ্য উপভোগ করে তখন তারা ছবিটা বা দৃশ্যটির বিভিন্ন অংশ বা দিকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই নির্বাচনমূলক আচরণ বা প্রতিক্রিয়ার বিভিন্নতার পেছনে আছে আমাদের প্রত্যেকের প্রেষণার বিভিন্নতা।

অতএব যখন ক্লাসে শিক্ষক সব ছেলেকে একটি পড়া দেখিয়ে বলেন যে এটা পড় তখন তার নির্দেশটি স্পষ্টই অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ। কেননা এই ধরনের নির্দেশের ফলে এবং প্রেষণার বৈষম্যের জন্য পাঠ্যবিষয়টির বিভিন্ন অংশের প্রতি বিভিন্ন শিক্ষার্থীর মনোযোগ যাবে এবং যগি শিক্ষক পরিষ্কারভাবে পঠনীয় বস্তুটিকে সুনির্দিষ্ট করে না দেন তবে বিভিন্ন শিক্ষার্থী প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন বস্তু শিখবে এবং তার ফলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে।

প্রেষণার এই আচরণ নির্বাচনের ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে অতীত শিখনের উপর। ছোট ছেলে ক্ষুধার্ত হলে বাড়ীর যেখানে খাবার থাকে সে সোজা সেখানে গিয়ে হাজির হয়। তার কারণ হল যে সে অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে এই জ্ঞান লাভ করেছে যে ঐ বিশেয় জায়গায় গেলে খাবার পাওয়া যাবে।

প্রেষণামূলক নির্বাচনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে প্রাণী তার চাহিদার তৃপ্তির জন্য নানা বিচ্ছিন্ন প্রকারের আচরণ করে যায় এবং শেষ পর্যন্ত যে আচরণের ফলে তার চাহিদাটির তৃপ্তি হয় সেই আচরণটি সে গ্রহণ করে, বাকী আচরণগুলি সে পরিত্যাগ করে।

প্রেষণার তৃতীয় কাজ হল ব্যক্তির আচরণকে বিশেষ পথে পরিচালিত করা। কোন

বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে কেবলমাত্র আচরণ সম্পন্ন করলেই হবে না, সেই আচরণকে এমন পথে নিয়ে যেতে হবে যাতে বঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় এবং তা থেকে প্রেষণার তৃপ্তি ঘটে। যেমন, কোন ব্যক্তির মধ্যে তৃষ্ণা জাগার ফলে সক্রিয়তা দেখা দিল এবং সে জন্য সে আচরণ সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত হল। কিন্তু তার পক্ষে অনির্দিষ্ট বা অপরিকল্পিত আচরণ করলেই চলবে না। তার আচরণ যদি জলের দিকে যথাযথ পরিচালিত না হয় তাহলে তার তৃষ্ণা কখনই মিটবে না। সে জন্য ব্যক্তির চাহিদার বাঞ্ছিত তৃপ্তির জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত লক্ষ্যের অভিমুখী আচরণ সম্পন্ন করতে শেখা।

টিপ্পনী

শিক্ষার ক্ষেত্রে এ তথ্যটিরও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। শিক্ষাকে কার্যকর করতে হলে প্রথমেই দেখতে হবে যে শিক্ষার্থী যেন তার লক্ষটি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা গঠন করতে পারে। লক্ষ্য সম্বন্ধে পূর্ণ ও স্পষ্ট ধারণা থাকলেই শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা লক্ষ্যের উপযোগী হবে এবং অনর্থক বা অপ্রয়োজনীয় আচরণ সম্পন্ন করে যে সময় ও শ্রমের অপব্যয় করবে না।

গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুকে যা শেখানো হয় তার লক্ষ্য সম্বন্ধে তার মধ্যে কোন স্পষ্ট ধারণা জন্মায় না। যেমন- নামতা মুখস্থ করানো, শব্দরূপ, ধাতুরূপ মুখস্থ করানো, বানান শেখানো, ব্যাকরণের নিয়মকানুন আয়ত্ত করানো, বিভিন্ন গাণিতিক ফরমূলা মুখস্থ করান ইত্যাদি প্রচলিত শিক্ষাদানের প্রক্রিয়াগুলি তাদের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে এতই সুদূর ও সম্পর্কহীন যে শিক্ষার্থীরা এগুলি শেখার প্রকৃত লক্ষ্য সম্বন্ধে কোনরূপ স্পষ্ট ধারণাই করতে পারে না। তার ফলে তারা এই প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করে যন্ত্রের মত উদ্দেশ্যহীনভাবে। শিক্ষার্থীকে যখন কোন বিশেষ উদ্ধৃতির ব্যাখ্যা করতে দেওয়া হয় বা কোন গদ্যাংশের সারমর্ম লিখতে বলা হয় তখনও শিক্ষার্থীর কাছে এই কাজগুলির প্রকৃত লক্ষ্য কি তা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় না। আবার অনেক সময় শিক্ষাপ্রক্রিয়াগুলির লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এমন সব লক্ষ্যের কথা বলা হয় যেগুলি শিক্ষার্থীর কাছে নিতান্তই অস্পষ্ট, অবাস্তব এবং তার বর্তমান জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন। লক্ষ্য সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর ধারণা স্পষ্ট ও পূর্ণ না হওয়ার ফলে তার শিক্ষামূলক প্রচেষ্টাগুলি অনিয়ন্ত্রিত, অসংহত ও যান্ত্রিক হয়ে ওঠে। এই ত্রুটি দূর করতে হলে যখনই শিক্ষার্থীকে কোনরূপ প্রচেষ্টা বা কাজ সম্পন্ন করতে নির্দেশ দেওয়া হবে তখনই তার প্রকৃত লক্ষ্যটি কি সে বিষয়ে শিক্ষার্থীকে পরিষ্কার ধারণা গঠন করতে সাহায্য করতে হবে। এই কারণেই আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীকে কোন অর্থহীন ও বিচ্ছিন্ন আচরণ করতে না দিয়ে সমগ্র কাজটিই তার সামনে উপস্থাপিত করা হয় যাতে সে তার সমস্ত প্রচেষ্টারই প্রকৃত লক্ষ্য কি সে সম্বন্ধে পূর্ণ ও পরিষ্কার ধারণা গঠন করতে পারে।

কেবলমাত্র লক্ষ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা তৈরী হলেই হবে না। শিক্ষার্থী যাতে সেই লক্ষ্যের উপযোগী আচরণ করতে পারে সেটা দেখাও সমানভাবে প্রয়োজন। অনেক সময় এমন হয় যে শিক্ষার্থী তার লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকলেও কোন্ আচরণের মাধ্যমে সেই লক্ষ্যে পৌছানো যায় সে সম্বন্ধে তার পরিষ্কার জ্ঞান থাকে না এবং তার ফলে সে উদ্দেশ্যহীন এলোমেলো আচরণ করে চলে। এই জন্য শিক্ষকের কর্তব্য হল বিভিন্ন আচরণের মধ্যে থেকে শিক্ষার্থী যাতে সর্বাপেক্ষা কার্যকর আচরণটি বেছে নিতে পারে সে সম্বন্ধে তাকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া। ডিউইর মতে যাতে শিশুর প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতাই তার কাছে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে সে দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া শিক্ষকের প্রধানতম কর্তব্য।

সৃজনশীলতার তত্ত্ব ও সংজ্ঞা

মানুষের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জগতে সৃজনশীলতার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সৃজনশীলতার অভাবে সকল প্রকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যায়। সৃজনশীলতার বিপরীত কথাটি হল গতানুগতিকতা, প্রাচীনপন্থিতা ইত্যাদি। যে সমাজে ব্যক্তিদের মধ্যে সৃজনশীল কার্যাবলীর অভাব দেখা দেয় সে সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা গতিহীন হয়ে ওঠে ও জনগণের অবসর যাপনের কার্যাবলীর মধ্যে কোন নূতনত্ব থাকে না। সে সমাজে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বহু প্রযুক্তিবিদ্ থাকা সত্ত্বেও কোন নূতন বস্তু আবিষ্কৃত হয় না, ব্যবসা-বাণিজ্যে কর্মী বহু থাকলেও কোনও নূতন বিক্রয়যোগ্য সামগ্রী তৈরী হয় না। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনেও খাদ্য, পানীয়, চলা-ফেরা প্রভৃতির মধ্যে কোন বৈচিত্র্য দেখা যায় না, চিন্তার জগতে সকলকে পুরাতন-চিন্তাধারাকে আকঁড়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। সেজন্য কোনও সমাজের অগ্রগতি যদি কাম্য হয় তাহলে সে সমাজের ব্যক্তিদের মধ্যে অবশ্যই যথেষ্ট পরিমাণে সৃজনশীল আচরণ দেখা যাবে।

টিপ্পনী

মনোবিজ্ঞানী রজার্স সৃজনশীলতার তত্ত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে সৃজনশীল প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে অন্তত তিনটি বস্তু অবশ্যই থাকবে। প্রথম, একটি দৃশ্যমান বস্তু যেটি সৃজনশীল প্রক্রিয়া থেকে প্রসূত হয়েছে। দ্বিতীয়, এই বস্তুটি অবশ্যই একটি নূতন সৃষ্ট পদার্থ হবে। বস্তুটির এই অভিনবত্ব অবশ্যই কোন সৃজনশীল ব্যক্তিরই অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু হবে এবং তাঁর নিজের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতক্রিয়া থেকে তা সৃষ্টি হয়ে থাকবে।

সেই কারণে সৃজনশীল আচরণ কোন বিশেষ বিষয়ে বা পন্থায় সীমাবদ্ধ থাকে না। অর্থাৎ একথা বলা চলে না যে এইভাবে আচরণ করলে বা কাজটি এইভাবে করলে সেটি একটি নূতন ও সৃজনমূলক বস্তু হবে। কেননা যে প্রক্রিয়ায় আর দশজন শিল্পী ছবি আঁকেন ঠিক সেই প্রক্রিয়াতেই ছবি এঁকে একজন সৃজনশীল শিল্পী একটি অভিনব ছবি এঁকে থাকেন।

অতএব রজার্সের দেওয়া সৃজনশীল আচরণের সংজ্ঞাটি হল যে একদিকে ব্যক্তির নিজস্ব অনন্যতা এবং অপর দিকে তার জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বস্তু, ঘটনা, ব্যক্তি বা পরিস্থিতির মধ্যে থেকে উৎসৃত কোন সম্বন্ধমূলক সৃষ্ট বস্তু যা তার কাজের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। দেখা যাচ্ছে যে রজার্সের দেওয়া সৃজনশীলতার সংজ্ঞায় 'ভাল' সৃষ্টি বা 'মন্দ' সৃষ্টির মধ্যে কোন পার্থক্য করা হচ্ছে না। কোন কঠিন রোগ নিরাময় করার পন্থার আবিষ্কার বা মানুষ খুন করার অভিনব উপায় উদ্ভাবন, দুইই সমানভাবে সৃজনশীল সৃষ্টি। বস্তুত ভাল সৃষ্টি ও মন্দ সৃষ্টির পার্থক্য সামাজিক মূল্যবোধের দিক দিয়ে নির্ণয় করা হয়ে থাকে যা কাল ও সমাজের বিভিন্নতা অনুযায়ী বিভিন্ন হয়ে থাকে। গ্যালিলিও তাঁর সময়ে যা আবিষ্কার করেছিলেন তা তঁর সময়ে অত্যন্ত দূষণীয় কাজ বলে পরিগণিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তা একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার বলে স্বীকৃত হয়েছে।

সৃজনশীলতার সংগঠন ও সংলক্ষণ

প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী গিলফোর্ড এবং তাঁর সহকর্মীরা সৃজনশীলতার সংগঠন এবং তার সংলক্ষণসমূহ সম্বন্ধে বিস্তারিত গবেষণা করেন। তাঁদের এই গবেষণা থেকে সৃজনশীলতার

প্রাথমিক সংলক্ষণগুলির একটি তালিকা পাওয়া গেছে। এই সংলক্ষণগুলি হল ঃ

(ক) চিন্তনের সাবলীলতা

(খ) নমনীয়তা

(গ) স্বকীয়তা বা নিজস্বতা

(ঘ) পুনর্ব্যাখ্যান

টিপ্পনী

(ঙ) সম্প্রসারণ

(ক) চিন্তনের সাবলীলতা

চিন্তনের সাবলীলতা সৃজনশীলতার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সংলক্ষণ। এই সংলক্ষণটি ব্যক্তির মনের ভাব বা চিন্তার উর্বরতার উপর নির্ভরশীল।

চিন্তনের সাবলীলতার মধ্যে আবার চার ধরনের সাবলীলতা পাওয়া গেছে। প্রথমটি হল শব্দমূলক সাবলীলতা। এই সাবলীলতার দ্বারা নূতন শব্দ সৃষ্টি করার শক্তিকে বোঝানো হয়ে থাকে। অভীক্ষার্থীকে উপযুক্ত অক্ষরের নির্বাচন ও সংযোজন করে নতুন শব্দ তৈরী করতে হয়।

দ্বিতীয়, অনুষঙ্গমূলক সাবলীলতা। অনুষঙ্গমূলক সাবলীলতার ক্ষেত্রে একটি প্রদত্ত শব্দের সমার্থক শব্দ নির্ণয় করতে হয়। শব্দমূলক সাবলীলতার ক্ষেত্রে যেমন অক্ষরের নির্ণয়ন এবং গ্রন্থনার শক্তির প্রয়োজন হয়, অনুষঙ্গমূলক সাবলীলতার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় প্রদত্ত শব্দটির অর্থ উপলব্ধি করে সমার্থক শব্দ নির্ণয় করা।

তৃতীয় প্রকৃতির সাবলীলতা হল অভিব্যক্তিমূলক সাবলীলতা। বাক্য বা বাক্যাংশ গঠনে অভীক্ষার্থীয় শক্তির দ্বারা অভিব্যক্তিমূলক সাবলীলতার পরিমাপ করা যায়। কত শীঘ্র এবং কত সুষ্ঠুভাবে ব্যক্তি শব্দের অবস্থিতির পরিবর্তন করে প্রয়োজনীয় বাক্য বা বাক্যাংশ গঠন করতে পারে তার উপর ব্যক্তির এই বৈশিষ্ট্যটি নির্ভর করে। যদিও এই শক্তিটি লিখন কার্যের ক্ষেত্রেই পরিমাপ করা হয়েছে তবু এটা বিশ্বাস করা হয় যে এটি বাচনের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

চতুর্থ প্রকারের সাবলীলতা হল ভাবমূলক সাবলীলতা। এর অর্থ হল ব্যক্তি তার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কত দূত এবং কত উপযোগী ভাব বা চিন্তার সৃষ্টি করতে পারে। বলা বাহুল্য বিভিন্ন প্রকারের সাবলীলতার মধ্যে এই বিশেষ প্রকারের সাবলীলতার উপযোগিতা সবচেয়ে বেশী। সাধারণত এই সাবলীলতার পরিমাপের ক্ষেত্রে অভীক্ষার্থীকে প্রশ্ন করা হয়-শক্ত, সাদা এবং খাওয়া যায় এমন একটি বস্তুর নাম কর, বা একটি সাধারণ ইঁট কত বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয় বল ইত্যাদি।

সকল সময়েই সমস্যার সমাধান নির্ণয় করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে অনুসন্ধান করতে হয়। বিভিন্ন সমাধান খুঁজে বার করে এবং সেগুলি পরীক্ষা করে তবে একটা সমস্যার প্রকৃত সমাধান পাওয়া যায়। সেজন্য এই ভাবমূলক সাবলীলতা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক।

(খ) নমনীয়তা

সৃজনমূলক চিন্তার ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে অতি অবশ্যই নমনীয় হতে হয়। পুরাতন বা পূর্বগৃহীত চিন্তাকে প্রয়োজন হলে পরিত্যাগ করে নতুন চিন্তা গ্রহণ করতে হয়। সেইজন্য নমনীয়তা সৃজনশীলতার একটি অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্য।

নমনীয়তা দু'প্রকারের হতে পারে। স্বতঃস্ফূর্ত নমনীয়তা এবং সঙ্গতিমূলক নমনীয়তা।

স্বতঃস্ফূর্ত নমনীয়তা বলতে বোঝায় যে ব্যক্তি বাধাহীনভাবে এবং সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বহু বিভিন্ন প্রকারের ভাব বা চিন্তার সৃষ্টি করতে পারে। কোনরকম আড়ষ্টতা বা সীমাবদ্ধতা তার চিন্তাকে আটকায় না। যেমন একটা 'বই'কে কতরকম ভাবে ব্যবহার করা যায় এই প্রশ্নের উত্তরে স্বতঃস্ফূর্ত নমনীয়তা যার আছে সে যে কেবল বইটি পড়া যায় তাই বলবে না সে বলবে বইটা ছুঁড়ে লোককে মারা যায়, বই মাথায় নিয়ে শোওয়া যায়, বই গ্লাসের 'ঢাকা' রূপে ব্যবহার করা যায়, এমনকি বই ছিঁড়ে তার পাতাতে চিঠি লেখা যায়। এই নমনীয়তা না থাকলে ব্যক্তির চিন্তা আড়ষ্ট এবং সঙ্কীর্ণ পরিসরে সীমাবদ্ধই থেকে যায়। বলা বাহুল্য সৃজনশীল আচরণের ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত নমনীয়তা বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে।

টিপ্পনী

অস্বাভাবিকতা বা অপরিচিত প্রথায় কোন সমস্যার সমাধান করার ক্ষেত্রে সঙ্গতিমূলক নমনীয়তার আয়োজন হয়। প্রদত্ত সমস্যাটি দেখলে মনে হবে যে গতানুগতিক প্রথায় সেটির সমাধান করা যাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটি সমাধান করতে হলে গতানুগতিক পন্থা ছেড়ে অপরিচিত বা অস্বাভাবিক পন্থার আশ্রয় নিতে হবে। এই গতানুগতিক পন্থা ত্যাগ করে যে কোন নূতন পন্থায় চলে যেতে হলে প্রয়োজন এই সঙ্গতিমূলক নমনীয়তা নামক বৈশিষ্ট্যটির। সৃজনশীল আচরণের ক্ষেত্রে এই সঙ্গতিমূলক নমনীয়তার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

(গ) স্বকীয়তা বা নিজস্বতা

সৃজনমূলক আচরণের মধ্যে স্বকীয়তা বা নিজস্বতা অতি অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হবে। তিনটি পন্থায় অভীক্ষার্থীর এই শক্তিটির পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। প্রথম দেখা হয় অভীক্ষার্থীর প্রদত্ত প্রতিক্রিয়া বা উত্তরের মধ্যে কতগুলি অপ্রচলিত বা অন্য অভীক্ষার্থীরা দেয়নি বা কম দিয়েছে এমন প্রতিক্রিয়া বা উত্তর আছে। এই প্রতিক্রিয়া বা উত্তরগুলি অভীক্ষার্থীর নিজস্বতা বা স্বকীয়তার পরিচায়ক। দ্বিতীয় দেখা হয় যে অভীক্ষার্থীর প্রদত্ত প্রতিক্রিয়া বা উত্তরগুলির মধ্যে কতগুলি দূরবর্তী প্রকৃতির বা সহজে প্রতীয়মান হয় না এমন প্রকৃতির। যে উত্তর সহজেই মনে আসে সেগুলিকে প্রতীয়মান প্রকৃতির বলা চলে এবং সে সব উত্তর বা প্রতিক্রিয়া দেবার ক্ষেত্রে অভীক্ষার্থীর কোন নিজস্বতা প্রতিফলিত হয় না। তৃতীয় পন্থা হল, দেখা হয় যে অভীক্ষার্থীর প্রদত্ত প্রতিক্রিয়া বা উত্তরগুলির মধ্যে কতগুলি তার 'চতুরতা'র পরিচায়ক। এখানে লক্ষনীয়, যে প্রতিক্রিয়া বা উত্তরগুলি 'অ-চতুর' পর্যায়ের সেগুলি ভাবমূলক সাবলীলতারই পরিচায়ক।

(ঘ) পুনর্ব্যাখ্যান

এ ছাড়া পুনর্ব্যাখ্যানের শক্তিকেও সৃজনশীলতার একটি উপাদান বলা হয়। কোন পরিচিত বস্তুর পুরাতন ব্যাখ্যাকে ত্যাগ করে ঐ বস্তুটিকে নূতন পন্থায় ব্যবহার করাও সৃজনশীলতার

একটি উপাদান। সৃজনশীল আচরণের ক্ষেত্রে অনেক সময় কোন বস্তুকে প্রচলিত পন্থায় ব্যবহার না করে সম্পূর্ণ নূতন পন্থায় ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়ে থাকে।

(ঙ) সম্প্রসারণ বা বিস্তার

সবশেষে সম্প্রসারণ বা বিস্তারকে সৃজনশীলতার আর একটি উপাদান বলে বর্ণনা করা হয়। এই উপাদানটির তাৎপর্য হল যে ব্যক্তি প্রয়োজন হলে অতি স্বল্প পরিমাণের উপকরণ থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা গঠন করতে সমর্থ হবে।

টিপ্পনী

সৃজনশীলতার চিহ্নিতকরণ

বিদ্যায়তনে লেখাপড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় তা এবং সৃজনশীলতা যে অভিন্ন নয় একথা মনোবিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদের বহু দিন আগেই উপলব্ধি করেছিলেন এবং প্রচলিত বুদ্ধ্যঙ্কের অভীক্ষার দ্বারা সৃজনশীলতার চিহ্নিতকরণ বা পরিমাপ করা যাবে না এটা তাঁরা বুঝেছিলেন। সেজন্য সৃজনশীলতার বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিহ্নিতকরণের জন্য বিশেষ প্রকৃতির মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা গঠনের প্রচেষ্টা চলে।

সৃজনশীলতার চিহ্নিতকরণের নানা প্রচেষ্টার মধ্যে ব্যক্তিসত্তা পরিমাপের প্রণালীর অনুরূপে গঠিত মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপ পদ্ধতিটি বিশেষভাবে প্রচলিত। এই ধরনের অভীক্ষাগুলির মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হল দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গিলফোর্ড এবং তার সহযোগীদের দ্বারা প্রস্তুত অভীক্ষা এবং সৃজনমূলক চিন্তার উপর টর‍্যান্সের টেস্ট। বর্তমানে সৃজনশীলতার চিহ্নিতকরণ এবং পরিমাপ উভয় উদ্দেশ্যেই এই অভীক্ষা দুটি বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই অভীক্ষা দুটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল।

NOTES

NOTES